উন্নয়ন ও পরিবর্তন চাই কিন্তু কলকাতার কাপ্তানি না-পসন্দ পাহাড়ে

পঁচাত্তরে পৌঁছেও নকশালবাড়ির পবন বিশ্বাস করে বিপ্লব আসবে কৃষকের লাঙলেই

নোটবন্দির জের এখনও পুরো কাটেনি ডুয়ার্সে

ডুয়ার্সের আর এক শতাব্দী প্রাচীন গ্রন্থাগার

এখন ডুয়ার্স

১-১৫ জুন ২০১৭। ১২ টাকা

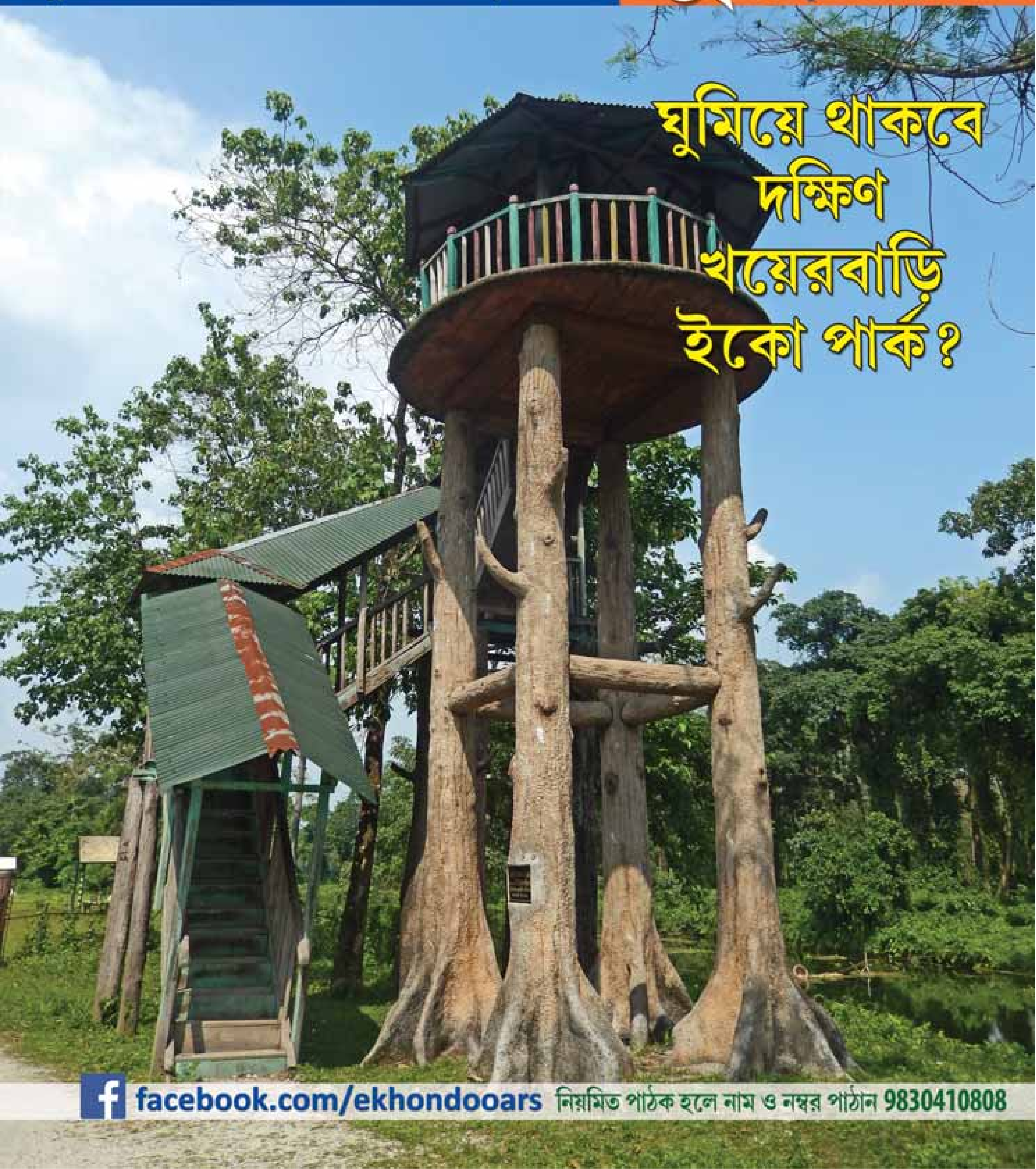

ঘুমিয়ে থাকবে দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ইকো পার্ক?

facebook.com/ekhondooars নিয়মিত পাঠক হলে নাম ও নম্বর পাঠান 9830410808

অত্যাধুনিক জীবনযাত্রা আমাদের জীবনকে অনেক স্বাচ্ছন্দ্যময় করে দিয়েছে, কিন্তু তার সাথে অনেক অসুখও এনে দিয়েছে।
তার মধ্যে কোষ্ঠকাঠিন্য অন্যতম.................

কোষ্ঠকাঠিন্য এড়াতে ৪ টি টিপস্ ঃ-

১. প্রচুর জল খান, প্রতিদিন অন্তত ৩ লিটার।

২. দৈনন্দিন খাবারে ফাইবারযুক্ত খাবারের মাত্রা বাড়ান।

৩. মশলাদার খাবার এড়িয়ে চলুন।

৪. রোজ অন্তত ৩০ মিনিট শরীর চর্চা করুন।

Issued for the public interest by **Pharmakraft**

From the makers of :

PICOME Susp.

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

জলপাইগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি শহরের মানুষের সাহায্যার্থে পুরো মার্চেন্ট রোড ও হসপিটালের রাস্তার দু'ধার দিয়ে চওড়া ফুটপাত তৈরি করে দিয়েছে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। ফুটপাত হওয়ায় যানবাহান চলাচলেরও বেশ খানিকটা সুরাহা হয়েছে। পার্কিং প্লেস নিয়ে সমস্যা অনেকাংশেই কম। ফলে যানজটের কবল থেকে রেহাই মিলেছে ওইসব এলাকায়। শহরের মানুষের কথা পুরসভা যেভাবে ভাবে, শহরবাসী সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া কামনা করে পুরসভা।

শ্রীমতী পাপিয়া পাল
উপ-পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রী মোহন বোস
পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

কফি হাউস ? ক্লাবঘর ?
নাকি আরও অনেক কিছু ?

চা-টা। আড্ডা। দাবা-ক্যারম-টেবিল টেনিস। পার্টি। গেট টুগেদার।
সেমিনার। বেড়াতে যাওয়ার বইপত্র ও বুকিং।

সোম-শুক্র বেলা ১টা থেকে রাত ৯টা। শনি-রবি বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা
ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭
পরিচালনায় NEST SOCIETY (Regn. No. S/2L/5822 of 2013-14)

আড্ডাঘর

মুক্তা ভবনের দোতলায়, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি - ৭৩৫১০১
ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭

যে কেউ সদস্য হতে পারেন। যে কেউ যোগ দিতে পারেন।

এককালীন সদস্য নেওয়া হচ্ছে

চতুর্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১-১৫ জুন ২০১৭

বাম থেকে ডাইনে যাওয়ার একশো আশি ডিগ্রি পথ প্রায় সম্পূর্ণ বাংলায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স

বাঙালি সম্ভবত পৃথিবীর একমাত্র জাতি যারা নিজেদের সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মন্তব্য করতে পারে সম্পূর্ণ নির্দ্বিধায়, ‘এ জাতটার সত্যিই ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই, বাঙালিদের দ্বারা সত্যিই কিছু হবে না!’ নতুন প্রজন্মের বঙ্গসন্তান নিজের রাজ্য ছেড়ে ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত, তা সে জনমজুরিই হোক বা লেখাপড়া-চাকরির উদ্দেশ্যেই হোক, তারা চাইছে যত দ্রুত সম্ভব নিজেদের বঙ্গীয় সত্তা-পরিচয়কে ঝেড়েঝুড়ে ফেলতে। এক পৈতৃক পদবি ছাড়া তাদের বাঙালি বলে ঠাহর করা ক্রমশই কঠিন হয়ে পড়ছে।

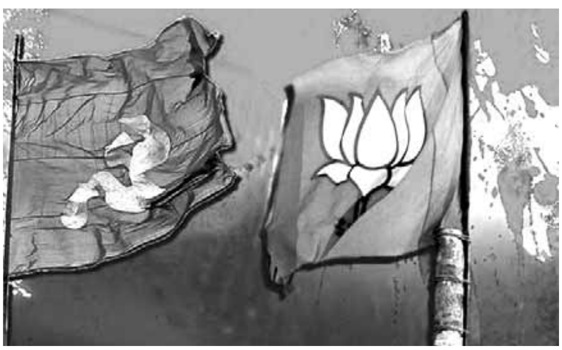

আর যারা নিরুপায় হয়ে থেকে যাচ্ছে এই বাংলায়, তাদের সামনে রাজনৈতিক ঝান্ডার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। আজ তাই কাগজে ধর্ষণ বা খুন কিংবা গণধোলাই অথবা নিদেনপক্ষে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টের মতো খবর ছাপার আগেই দেখা হয় অপরাধী বা অভিযুক্তকে কোনও রাজনৈতিক শিবিরের বলে চিহ্নিত করা যায় কি না। সেই অভিযুক্তকে সেই দলের মিছিলে বা পার্টি অফিসে দু’-একবার ঘোরাফেরা করতে দেখা গেলে তো কথাই নেই। কাগজের খবর পড়লে মনে হয় যেন অপরাধের আগে সে দলকে জানিয়েই বা দলের অনুমোদন নিয়েই কাজটা করেছে। তাই আপনার বয়স-লিঙ্গ-ধর্ম-শ্রেণি- গোত্র ইত্যাদি প্রমাণের আগে আপনি কোন দলের সমর্থক সেটা ব্যক্ত করাটা আজ অনেক বেশি জরুরি। রাজনীতি আজ বাঙালির রক্তে-মজ্জায় মাদকের মতো মিশে গিয়েছে যা ধীরে ধীরে তাকে নিয়ে যাবে মৃত্যুর দিকে। আবার হঠাৎ করে রাজনীতি বন্ধ করে দেওয়ার প্রক্রিয়া চালু করলেও বিপদ— ‘উইথড্রয়াল সিম্পটম’ বরদাস্ত করতে পারবে না ‘নাজুক’ এই জাত। অতএব মরণ অনিবার্য!

এ বঙ্গের মসনদে যাঁরাই বসেছেন তাঁরাই হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছেন এই সত্যকে। জ্যোতিবাবু যা বুঝতে পেরে পঁচিশ বছর ব্যাটিং চালিয়ে গিয়েছেন অপরাজিত, আজকের অবিসংবাদিত নেত্রীর তা হৃদয়ঙ্গম হয়েছে সম্ভবত আরও অনেক গুণ বেশি, তিনিও ভাল করেই জানেন ছিন্নমূল আত্মগরিমায় মশগুল এই জাতটাকে কীভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়। জ্যোতিবাবুর আমলের ক্রুটিবিচ্যুতিগুলির পরিমার্জিত প্রয়োগ আজকের নেত্রীকে আরও অনেক দূর টেনে নিয়ে যেতে পারবে তা বলাই বাহুল্য। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান যখন দেখায় শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে এ রাজ্যের সূচকরেখা নিম্নগামী তখন রাজ্যের শিক্ষায় বাংলাকে বাধ্যতামূলক করা যে এক হিসেবে ‘মাস্টারস্ট্রোক’ তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

তবে আজ থেকে পঞ্চাশ-একশো বছর বাদে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যবইয়ে পড়বেন, মমতা-যুগের গুরুত্ব বাংলার ইতিহাসে অপরিসীম। কারণ এই সময়েই বাংলার মানুষ চরম বামপন্থা থেকে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে চরম দক্ষিণপন্থায় আশ্রয় নেয়, এই সময়েই বাংলায় টকটকে রক্ত লাল রং বদলে গেরুয়া হয়ে যায়। তবে এ সময়ে বাঙালি জাতির ‘মহাবিলুপ্তি’ নাকি ‘মহাবিবর্তন’ ঘটে তা এখনও খুব একটা স্পষ্ট নয়।

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স ৫

দূরবিন ৮
পরিবর্তন চাই উন্নয়ন চাই কিন্তু ‘কলকাতার কাপ্তানি’ পাহাড়িদের না-পসন্দ!

উত্তরপক্ষ ১২
নোটবন্দির প্রভাবে এখনও উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ এলাকায় আর্থিক সংকট চলছে

চায়ের ডুয়ার্স, ডুয়ার্সের চা ১৪
রুখাশুখা, মৃতপ্রায় নদীগুলি বাঁচিয়ে রেখেছে ডুয়ার্সের চা-বাগিচার শ্রমিকদের

কোচবিহার থেকে কালিম্পং ১৮
পঁচাত্তরের পবন সিংহের আজও বিশ্বাস বিপ্লব একদিন আসবে কৃষকের লাঙলেই

পর্যটকের ডুয়ার্স ২২
কবে জাগবে আবার ঘুমিয়ে থাকা দক্ষিণ খয়েরবাড়ি?

ডুয়ার্স তরাই শতাব্দী এক্সপ্রেস ৩০
এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল গ্রন্থাগার ডুয়ার্সের একশো বছরের সংস্কৃতির পীঠস্থান

ধারাবাহিক ডুয়ার্স
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ২০
লাল চন্দন নীল ছবি ৩২
তরাই উৎরাই ৩৫
ডুয়ার্স থেকে শুরু ৩৭
ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস ৪৩

নিয়মিত বিভাগ
সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স ২৮
খুচরো ডুয়ার্স ৬
ডুয়ার্সের ডায়েরি ৪০
ডুয়ার্সের অনাদৃত রতন ৪১
মুকুল রক্ষিত

শ্রীমতী ডুয়ার্স
গ্রীষ্মের প্রকোপ থেকে ফলই সুস্থ রাখতে পারে শরীর ২৬
ডুয়ার্সের ডিশ ২৬

প্রচ্ছদ ছবি: তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদনা শ্বেতা সরখেল
অলংকরণ শান্তনু সরকার
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা
ইমেল ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস,
প্রকাশনা প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

চিকিৎসাবধান

তবে যে বলা হচ্ছে, রাজ্যে ডাক্তার নেই? কই, বালুরঘাটে গেলে তো মালুম হয় না সে কথা! কত্ত কত্ত ডাক্তার সেখানে। হাটে-বাজারে-ক্লিনিকে-গাছের নিচে শুধু ডাক্তার আর চিকিৎসক। বেশির ভাগই নাকি প্রবাসী আর কেউ কেউ নাকি মেডিক্যাল কলেজের বদলে গুরুমুখে শিখেছে। তা এদের দাপটে রোগীরাও মহানন্দে দিন কাটাচ্ছেন। রোগ ধরলে কোনও টেনশন না নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লেই হল। ঠিক দু'-পাঁচজন জুটে যাবে আপনাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তারপর ডাক্তার আপনাকে দেখে, লিখে জানিয়ে দেবে, কোন দোকান থেকে ওষুধ কিনবেন। অন্য দোকানে গেলে আপনি সব ওষুধ পাবেন না, আর সব ওষুধ না কিনলে কেউ আপনাকে ওষুধ বেচবে না। ভাবুন তো! কী টেনশন! তবে সেই টেনশনে পড়লে নিজের রোগ সম্পর্কে ভুলে যাওয়া যায় বলেই রোগীরা ভারী খুশি খুশি মনে এ দোকান-সে দোকান ঘোরে। কী ভাল, তা-ই না?

হাটে-গোবরে

এটা তপনবাবুর ফিল্মের নাম থেকে নেওয়া হয়েছে ময়নাগুড়ি হাটের রোমাঞ্চ

বোঝানোর জন্য। শোনা যাচ্ছে যে, আজকাল ময়নাগুড়ি ব্লকের গিন্নিরা কর্তাকে জব্দ করতে চাইলে বর্ষাকালের ময়নাগুড়ি হাটে পাঠিয়ে দেন বাজার আনার জন্য। তা বর্ষা এলে সে এক হাট হয় বটে!
কাদা-ময়লা-গন্ধ-প্যাচপ্যাচানি নিয়ে আপনি যতটা খারাপ ভাবতে পারেন, তার থেকে আরেকটু খারাপ হয়ে থাকে হাট। যদিও বর্ষা এখনও আসেনি, কিন্তু ঝড়বৃষ্টি তো হচ্ছেই। হাটুরের হাঁটুও তাই খুলে যাচ্ছে। হাট সেরে জামাকাপড় কাচতে হয় বলে খরচ বাড়ছে। পসারিদেরও আহ্লাদের শেষ নেই। বাণিজ্যও হচ্ছে, 'হোলি হ্যায়'ও হচ্ছে। তা এই হাট শুনেছি ডুয়ার্সের বহু পুরনো সবজি হাটগুলির একটা, যা এখনও টিকে আছে। এখানেই তো কথা! নতুন হলে কি এমন দশা হত? এত পুরনো বলেই না নষ্ট হয়ে গিয়েছে! তবে সরকারি প্রতিনিধিরা কয়েক বছর ধরে তোতাবুলি আউড়ে বলছেন, 'কিছুদিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে।' নিশ্চয়ই হবে ভাইটি! এ বছর লাস্ট হেটো হোলিটা খেলে নাও!

রাজকাহিনি

শোনো! রাজগঞ্জের এক প্রাইমারি স্কুলের কাহিনি শোনো। মহামানবরা বলে গিয়েছেন যে, প্রাণে প্রাণে তফাত কোরো না। শিক্ষায় সবার অধিকার। গোটা বিশ্বে এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে একমাত্র সেই স্কুল। সেখানে বালক-বালিকাদের সঙ্গে এক ভূমে পড়াশুনো করে গোরু আর ছাগল। একসঙ্গে মিডডে মিল খেতে মাঠে জমায়েত হয়। না, গোমাতা খিচুড়ি খান না। ছাগলেরও ডিমে অ্যালার্জি। কিন্তু ভোজনরত বালক-বালিকাদের নাকের ডগা দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এই সীমানা প্রাচীরহীন শিক্ষায়তন ঘিরে এক পরিখা আছে, যা হাতির হামলা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নির্মিত। পড়ুয়াদের যে কেউ সে পরিখায় পড়ে যেতে পারে, তবুও সবাই নির্লিপ্ত। গোরু-ছাগলের ছানাদের সঙ্গে একত্রে পাঠগ্রহণ এবং তাদের উপস্থিতিতে খাদ্যগ্রহণের কারণেই মানব ছানাদের এই নির্লিপ্তি। নির্লিপ্ত ভাব কি জ্ঞানের লক্ষণ নহে?

নিধিরাম

গোরুমারায় জোড়া গন্ডার হত্যা রহস্যের পর এই তো সে দিন ধুন্ধুমার গুলি চলল সে জঙ্গলে। যারা চালিয়েছে, তারা যে পশুপ্রেমী নয় তা অবশ্যি বলে দিতে হয় না। এ নিয়ে প্রবল হইহট্টগোল হওয়ায় গম্মেন্ট বলেছিল, রোসো! এমন পাহারা বসাব যে চোরাশিকারিরা চোখে সরষে ফুল দেখবে। তা ভদ্দরলোকের এক কথা! গোরুমারায় পাহারাদার বেড়ে গিয়েছে। অবশ্যি পাহারাদার না বলে বলা উচিত যে নিধিরাম বেড়ে গিয়েছে। কারণ চোরাশিকারিদের

বুলেট আটকাবার সেরা অস্ত্র হিসেবে 'লাঠি'ই বেছে নিয়েছে তারা। অ্যায়সা লাঠি ঘোরাবে না যে, বুলেট সো-ও-জা ফিরে যাবে শিকারিদের বন্দুকে। না না! এ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশের কোনও মানেই হয় না। হলিউডি বায়োস্কোপে এ জিনিস কব্বে দেকিয়ে দিয়েচে মামা! ওরা সিনেমায় পারলে আমরা বাস্তবে পারব না? সুতরাং নিশ্চিন্তে থাকুন।

ডিজিতাল

মানে ডিজিটাল কারণে তালে পড়লে যা হয়, সেটাই। গেরস্ত এদ্দিন র‍্যাশন আনতে যাচ্ছিল পাড়ার মোড়ের দোকান থেকে। র‍্যাশন কার্ড ডিজিটাল হওয়ার পর তার দোকান এখন দশ কিলোমিটার দূরে। কেউ কেউ তো র‍্যাশন তুলতে বাসে চেপে পাশের জেলাতেও যাচ্ছে বলেও শোনা গেল। কিন্তু কত্তা! এ না হয় মানা গেল, কিন্তু এমন এমন দোকানের ঠিকানা লেখা কার্ড এসেছে, যা এফবিআই-সিবিআই লাগিয়েও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে যে! সব মিলিয়ে ঘোর ডিজিতালে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে জলপাইগুড়ি জেলার রাশি রাশি মানুষ। ডিজিটাল র‍্যাশন কার্ড হাতে পাওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে এই গন্ডগোল। নামধাম ভুল হওয়া তো আছেই, সঙ্গে উপরি উপহার র‍্যাশন দোকানের

ঠিকানা বদল। আর সে যে কী বদল তা গেরস্তই জানে।

ফুটুর ডুম

দিব্যি ছিল লাটাগুড়ির লেক। টুরিস্টরা এসে নৌকো বিহার করতেন, হাঁসদের জলকেলি দেখতেন, আর খচাখচ সেল্‌ফি তুলতেন। কিন্তু সুখ কি আর চিরস্থায়ী হয়? লেক থেকে টুকটাক হাঁস ভ্যানিশ হচ্ছিল। তারপর দেখা গেল চোরবাবাজিকে জলে সাঁতার কাটতে। বোঝা গেল, চোর শিরোমণি আসলে এক কিশোর অজগর। দিব্যি লেকে ঘরবাড়ি বানিয়ে বসবাস করছেন। এর পর কি আর লেকে নৌকোর পারমিশন দেওয়া যায়? ওদিকে আবার আমগুড়ি গ্রামের গেরস্ত বেশ জমিয়ে রান্না করছিলেন। কোত্থেকে বিনা নেমন্তন্নে হাজির এক চিতা! রান্নার বদলে রাঁধুনিকেই চেখে দেখার মতলব ছিল বোধহয়। আর, হাতিরা তো সে দিনও একটা প্রাইমারি স্কুলে হামলা চালিয়েছে। এই জন্যেই মাঝে মাঝে বলি, ডুয়ার্স আর দোপেয়েদের দখলে থাকবে নাকো!
রান্নাঘর-শিক্ষা-পর্যটন-চা-বাগান— এই চারটে দখল করে নিলে ডুয়ার্সে আর কী বাকি থাকে বাপ? ফুটুর এক্কেবারে ডুম!

ষাঁড়াষাঁড়ি

দিব্যি চলছিল কীর্তনের আসর। রাখাল রাজার কীর্তিকলাপের বর্ণনায় উদ্বেল হচ্ছিল পাবলিক। হেনকালে বজ্রপাত!

রাখালের সঙ্গে গোরুর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। এমনিতেই দেশ জুড়ে গোমাতা নিয়ে আদিখ্যেতার বহর দেখে গোপিতারা ক্ষুর শানাচ্ছিলেন। কীর্তনের আসরে কন্টিনিউ 'হরি গো', 'গেল গো', 'মরি গো' ইত্যাদি শুনে আর সামলাতে পারেনি। দুই গোপিতা, থুড়ি, ষণ্ড মিলে তাই কীর্তনের আসরেই লাগিয়ে দিল শৃঙ্গযুদ্ধ। পলকে আসর লাটে। শ্রীখোল, করতাল, হারমোনিয়াম ফেলে গোসাঁই ঝড়ের বেগে হাওয়া হয়ে গেলেন। পাবলিকও ছন্নছাড়া। কিন্তু এতেও থামেনি ষণ্ডযুগল। ডজনকয়েক ভক্তকে গুঁতিয়ে, মাইক ভেঙে, স্টেজের দফারফা করে তারপর ক্ষান্ত হয়েছে রণে। এই জন্যই বলি রে বাপ, নিউট্রাল থাক! খালি গো গো করিসনে। পুরুষদের কথাটাও ভাবিস। মালদার ঘটনা।

টুক্রাণু

ফেল করে পাশের দাবিতে ধুন্ধুমার আন্দোলন কোচবিহারের এক স্কুলে। জৈন্তি অরণ্যে হরিণ ছানা ধরে বেজায় প্যাঁচে চার পর্যটক। বানারহাটে গেরস্তের বেডরুমে গোখরো। হাইড্রেন নিয়ে হাই-ফাই সমস্যা মালবাজারে। যানজট বাধাতে অসীম প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছেন জলপাইগুড়ির টোটোচালকরা। মালদার মর্গে ভূতের গুজব। শতবর্ষে পা দিয়ে খাবি খাচ্ছে ফণীন্দ্র দেব স্কুল। দশ টাকা নিয়ে মারপিট করে চিকিৎসায় হাজারখানেক খরচা দুই যুবকের— কুমারগ্রামের কাছে। আলুতে ঘা খেয়ে বেগুনে ভরসা রাখছেন ডুয়ার্সের কৃষকরা।

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি
৯৪৩৪৩২৭৩৪২
শিবমন্দির
অনুপ দাস ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
মালবাজার
বিশ্বনাথ বাগচি ৯৮৩২৬৮৩৯৮৮
চালসা
দিলীপ সরকার ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল
৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
লাটাগুড়ি
বিশ্বজিৎ রায় ৯০০২৪০৯৮৯৩
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৪৩৪৪১২৬৪৯
আলিপুরদুয়ার
দীপক হোড় ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার
জয়ন্ত দাস ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
৯৮৫১২৩৪৮৮৯
মাথাভাঙা
নেপাল সাহা ৮৯৬৭৯৯৫৮৮৭
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি
৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার ৯৪৩৪৪২৩৫২২
বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

পরিবর্তন চাই। উন্নয়ন চাই। কিন্তু ‘কলকাতার কাপ্তানি’ পাহাড়িদের না-পসন্দ!

এবার অন্তত বিমল গুরুং হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছেন, কেবল গোর্খাল্যান্ডের আওয়াজ তুলে মসনদ ধরে রাখা যাবে না! পাহাড়িরা যে উন্নয়ন চাইছেন, পরিবর্তন চাইছেন— এবারে পুর ভোটের ফলাফলের পর পরিষ্কার বলা যায়। আসনসংখ্যায় প্রতিপত্তি বজায় থাকলেও প্রাপ্ত ভোটের হিসেবে খুব একটা স্বস্তিকর জায়গায় নেই মোর্চা। এবার তাদের ভরসা ছিল একটাই, উন্নয়ন বা পরিবর্তনের পক্ষে হলেও পাহাড়িরা আজও সমতলের নেতাদের প্রভুত্ব মেনে নিতে নারাজ আগের মতোই। আর এই বিকল্প শক্তি হওয়ার দৌড়ে তৃণমূলের শেষ পর্যন্ত পাহাড়িদের গণ-আস্থা জেতা সম্ভব নয়। সেই ইঙ্গিতও মিলেছে এই ফলাফল থেকেই।

বলাই বাহুল্য, অতি সম্প্রতি একটি পুরসভার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই রাজ্যে রাজনৈতিক উত্তাপ ও সন্ত্রাসের অভিযোগের বাষ্প সমগ্র রাজ্যে যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল তা এক কথায় বলা যায়, আগামী দিনের গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক মণ্ডলে এক ভয়াবহ অশনিসংকেতের দেয়াললিখন। প্রশ্ন উঠেছে গণতন্ত্রকে এভাবে হত্যা করে তার শবদেহের উপরে বসে তাকে স্তব্ধ করার বীভৎস পরিণতির কথা নিয়ে।

শাসক ও বিরোধী— এই দু'টির অবস্থানই গণতন্ত্রের জিয়ন ও মরণ কাঠি। শুধু শাসকের অর্থ তো এক মেরুর চৌম্বকদণ্ডকে খোঁজা। চুম্বক, সে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রই হোক অথবা বিশাল আকৃতির, তার দু'টি মেরুর অবস্থান অবশ্যম্ভাবী। তা না হলে চুম্বকত্ব থাকে না। তেমনই শাসকদলের ভাবনা যদি হয়, দেশ হবে বিরোধীশূন্য, তবে তো দেশের গণতন্ত্রই বিলুপ্ত হয়।

প্রশ্নটা তৃণমূল, কংগ্রেস, সিপিএম বা বিজেপি-র নয়। প্রশ্নটা গণতন্ত্রের। ভাবনাটা সবার। ভাবা উচিত সবারই।

সমতলের এই পুরসভার নির্বাচনে বিজেপি বাদে সব বিরোধী দল শাসক তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রশাসন ও বহিরাগত সমাজবিরোধীদের সহযোগিতায় ভোটদানে বাধা, বুথ দখল ইত্যাদির মতো মারাত্মক অভিযোগে নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার

দূরবীন

সৌমেন নাগ

কিছু পরেই এই নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াবার কথা ঘোষণা করেছে।

শাসক তৃণমূল শাসকসুলভ রীতিতে বিরোধীদের এই অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছে, নির্বাচনে পরাজয় হবে জেনে তারা এই প্রার্থী প্রত্যাহারের নাটকীয় ঘোষণা করেছে। মজার ব্যাপারটা হচ্ছে, শাসকের আসনে বসে শাসনের দণ্ড হাতে পেয়ে গেলে সবাই ভাবে, শাসনের এই আরামকেদারাটা যেন তার জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতন একেবারে পাকা ব্যবস্থা। এই ভাবনা স্বাধীনতার পর ক্ষমতার আসনে বসে কংগ্রেস ভেবেছে, পশ্চিমবাংলায় সিপিএম ক্ষমতায় এসে ধরে নিয়েছে, এখন তৃণমূল তা-ই ভাবছে। পৃথিবীর ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখা যাবে সেই একই ইতিহাস। সব সাম্রাজ্যের একনায়করা ধরেই রেখেছিল তাদের সাম্রাজ্য অবিনশ্বর, তাদের শাসনদণ্ডও চির-অক্ষয়। উর, থ্রিবস, ক্রিট, ট্রয়, গ্রিস ও রোম সাম্রাজ্যের পাশাপাশি গুপ্ত, মৌর্য বা মোগল সাম্রাজ্য তথা তাদের সম্রাটের হাত থেকে ক্ষমতার দণ্ড একে একে বিনষ্ট হয়েছিল বা হস্তান্তরিত হয়েছিল। ইতিহাসের সেই প্রবাহ তো আজও প্রবহমান। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আজ যে শাসক, কাল সে বিরোধী আসনে উপবিষ্ট। দীর্ঘকাল একচ্ছত্র ক্ষমতাভোগের পর কংগ্রেস কেন্দ্রে বিরোধী দলের মর্যাদারক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সাংসদকে জয়ী করার মতো ক্ষমতা দেখাতেও আজ অক্ষম। আমরা ২৩৫, ওরা ৩৫— একদা গণতন্ত্রের পক্ষে এই কুখ্যাত দম্ভোক্তি করা মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও তাঁর দল সিপিএম এই রাজ্যে এখন প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা অর্জনেও ব্যর্থ।

আজ এই নির্বাচনে বিরোধী দলগুলো সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে নির্বাচন থেকে প্রার্থীদের তুলে নেওয়ার খেলা করতে বাধ্য হচ্ছে। বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ক্যামেরার চোখ তাদের এই অভিযোগকে অনেকাংশ সমর্থন করেছে। মজাটা এখানেই। এই সিপিএম যখন শাসন ক্ষমতায় ছিল, তখনও আজকের শাসকদল তৃণমূল বিরোধী অবস্থান থেকে একই অভিযোগ আনত। আর একইভাবে শাসক সিপিএম তাকে অস্বীকার করত। নির্বাচনে হার-জিত আছে। প্রশ্নটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে

মান্যতা দেওয়া হচ্ছে কি না তা নিয়ে। কারণ যে কোনওভাবে জিতে যাওয়াই কিন্তু শেষ কথা নয়। মূল বিষয়টি হচ্ছে মানুষের আস্থার প্রকৃত প্রকাশের। শাসকের হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতা থাকে। প্রসাদ বিতরণের সামর্থ্যও তার অনেক বেশি। ভয় বা প্রলোভনের মাধ্যমে ভোট বাক্স ভরাট করার মধ্যে যেমন ক্ষমতার প্রকৃত আস্থার প্রকাশ ঘটে না, তেমনই ভবিষ্যতের বিপদের দেয়াললিখন যে শুরু হয়ে যায় তা বোঝার ক্ষমতা ও খোলা মনের অবলুপ্তি ঘটে।

আজও সমতল থেকে মুখ ফিরিয়ে পাহাড় !

অথচ দার্জিলিং পার্বত্য এলাকাতে যে ৪টি শহরের পুর নির্বাচন হল, সেখানে শান্তি বা গণতন্ত্র কোনওটাই বিন্দুমাত্র বিঘ্ন ঘটেনি। এই চারটি পুরসভার মোট আসন— দার্জিলিং- ৩২, কার্শিয়াং- ২০, কালিম্পং- ২৩ এবং মিরিকে ৯টি অর্থাৎ মোট ৮৪টি আসন। তৃণমূল এই ৮৪টি আসনের মধ্যে পেয়েছে— দার্জিলিং-১, কার্শিয়াং- ২, কালিম্পং- ২ এবং মিরিকে ৬টি। একমাত্র মিরিকেই তারা পুর বোর্ড গঠন করার অবস্থায় এসেছে। অপর পক্ষে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা— দার্জিলিং- ৩১, কার্শিয়াং- ১৭, কালিম্পং- ১৯ এবং মিরিকে ৩টি অর্থাৎ ৮৪টি আসনের মধ্যে ৭০টি আসনে বিজয়ী হয়েছে।

> দীর্ঘদিন পরে পাহাড়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যে নির্বাচন হয়েছে এবং সব দলই যেভাবে এই নির্বাচনে অবাধে তাদের প্রচার করতে পেরেছে তা নিশ্চয়ই অভিনন্দনযোগ্য। কোনও পক্ষই অভিযোগ করতে পারেনি, তারা তাদের নির্বাচনী প্রচারে বাধা পেয়েছে। এখানে শাসক তথা প্রধান দল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। রাজ্যের শাসকদল হয়েও তৃণমূলের আশঙ্কা ছিল, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা নির্বাচনী প্রচারে বাধা দেবে এবং নির্বাচনের দিন বুথে বুথে সন্ত্রাস সৃষ্টি করবে।

ক্ষুদ্রতম পুরসভা মিরিকে তৃণমূলের এই জয়কে ‘পাহাড় জয়’ বলে তৃণমূলের পক্ষ থেকে উচ্ছ্বাসের বন্যায় ভরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার, দীর্ঘদিন পরে পাহাড়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যে নির্বাচন হয়েছে এবং সব দলই যেভাবে এই নির্বাচনে অবাধে তাদের প্রচার করতে পেরেছে তা নিশ্চয়ই অভিনন্দনযোগ্য। কোনও পক্ষই অভিযোগ করতে পারেনি, তারা তাদের নির্বাচনী প্রচারে বাধা পেয়েছে। এখানে শাসক তথা প্রধান দল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। রাজ্যের শাসকদল হয়েও তৃণমূলের আশঙ্কা ছিল, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা নির্বাচনী প্রচারে বাধা দেবে এবং নির্বাচনের দিন বুথে বুথে সন্ত্রাস সৃষ্টি করবে। তাই নির্বাচন কমিশন তো বটেই, রাজ্য প্রশাসন সেই আশঙ্কাকে প্রতিরোধের প্রাচীরে বন্দি করতে সমস্ত রকমের আয়োজন করেছিল। তাই এই প্রশ্ন অতি সংগতভাবেই উঠে আসতে পারে, পাহাড়ের নির্বাচন পরিচালনায় প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন যদি এমন নিরাপত্তামূলক

ব্যবস্থা গ্রহণ করে সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে পারে, তবে সমতলের ক্ষেত্রে তারা কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে কীভাবে এমন নির্বিকার সমাধিগ্রস্ত হতে পারে? সমতলে সে দিন নির্বাচন কমিশনের কোনও অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায়নি। বিরোধী দলের নেতৃত্ব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েও দেখা পাননি বা তিনি তাঁদের মুখোমুখি হয়ে তাঁর দপ্তর যে তার দায়িত্ব পালন করছে— এই আমলাতান্ত্রিক গতানুগত কথাটা বলতেও সাহস হারিয়ে ফেলেছিলেন। অথচ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অধিকার ও ক্ষমতাকে তাঁর পূর্বসূরি মীরা পান্ডে শাসকদলের বিরুদ্ধে পাঞ্জা কষেই এই রাজ্যে প্রতিরোধ করে গিয়েছিলেন।

এমন ভোট পাহাড়ে আগে দেখা যায়নি!

এবারের পুর নির্বাচনে পাহাড়ের মানুষ দেখতে পেয়েছিল এক অভূতপূর্ব আয়োজন। রাজ্য সরকারের মন্ত্রীসভার প্রায় সব মন্ত্রীই এখানে পুর নির্বাচনে তৃণমূলের বিজয়রথের ঘোড়াকে জয়ী করতে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিলেন। সরকারি দল, তার উপর মন্ত্রী। প্রশাসনের আমলারা তাঁদের ইচ্ছাপূরণের দায়িত্ব নিতে তাঁদের নির্দেশ অনুসারে কাজ করার দায়িত্ব পালন করেছেন।

পশ্চিমবাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী— শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গে এসেছেন অনেকবার। কিন্তু শিলিগুড়ির দার্জিলিং মোড় বা সেবকের তিস্তা ব্রিজ থেকে তাঁর গাড়ির চাকা কখনও ঘোরেনি পাহাড়ের দিকে। সেই পাহাড় পশ্চিমবাংলার মানচিত্রে রাজ্যের অচ্ছেদ্য ভূখণ্ড, কিন্তু মানসিকভাবে এমনই বিচ্ছিন্ন যে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সামনে-পিছনে নিরাপত্তার বলয়ের বৃত্ত নিয়েও সেখানে যেতে মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। সেই ব্যর্থতার এক রূপ দেখাতে সমতলের শিলিগুড়ি দার্জিলিঙের একটি মহকুমা হলেও সেখানে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার যে কোনও মিছিল বা সমাবেশ অনুষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে বাধানিষেধ আরোপ করেছিলেন। দেয়ালে দেয়ালে গোর্খাল্যান্ডের বিরোধিতা করে পোস্টার লিখে বাঙালি ভাবাবেগকে ভোট বাক্সে আনার চেষ্টা করেছেন। অপর দিকে এর ফলে পাহাড়ের এই জাতিসত্তার আন্দোলন যে ধীরে ধীরে পাহাড় বনাম সমতল এবং বাঙালি ভাবাবেগ ও পাহাড়ি জাতিসত্তার দ্বন্দ্বে পরিণত হতে চলেছে, সেই ভয়ানক সত্যটি হয় জেনেও না জানার ভান করেছেন, না হয় সেই বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাটাও হারিয়ে ফেলেছিলেন। ফলে একসময়ে পাহাড়ে সর্বত্র একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী

সিপিএম এবারের নির্বাচনে মাত্র কয়েকটি আসনে প্রার্থী দিতে পেরেছিল, বহু ক্ষেত্রে তাদের প্রার্থী দুই অঙ্কের ভোটও পাননি। অথচ একটা সময় এই মিরিক যখন শিলিগুড়ি বিধানসভার সঙ্গে যুক্ত ছিল, তখন সিপিএম প্রার্থী মিরিক থেকে বিপুল পরিমাণে ভোটের পার্থক্য দিয়ে সমতলের পিছিয়ে থাকাকে পুষিয়ে জেতার জায়গায় পৌঁছে যেতেন।

পাহাড়ে এবার তবে জিতলে কে?

এবারই দেখা গেল, পাহাড়ে এই পুর নির্বাচন আর পুর নির্বাচনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটা রূপান্তরিত হয়েছে রাজ্য সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন কর্মসূচি বনাম সেই শতবর্ষ ধরে যে দাবি চলে আসছে, সেই গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে।

সুবাস ঘিসিং এই দাবি নিয়ে বাঘের পিঠে চেপে পাহাড়ের জাতীয়তাবোধের আবেগকে সংহত করে গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবি তুলেছিলেন। পাহাড়ের জনতা ধরে নিয়েছিল, সুবাস ঘিসিং সেই দাবি পূরণ করতে পারবেন। বাম-সরকার সুবাস ঘিসিঙের নানা আর্থিক দুর্নীতিতে চোখ বুজে ছিল। তারা মনে করেছিল, সুবাস ঘিসিঙের এই দুর্নীতি দেখে পাহাড়বাসীর মনে যে ক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছে, তাকে মূলধন করে সিপিএম তার হারানো রাজ্য উদ্ধার করতে পারবে। বুদ্ধদেববাবুরা বুঝতে পারেননি পাহাড়ের মূল ভাবনাটি জাতিসত্তাকে নিয়ে। সেখানে উন্নয়ন বা দুর্নীতির প্রশ্নটি জাতিতত্ত্বের ভাবনাকে ছাপিয়ে যেতে পারবে না। বিমল গুরুং নিয়েছিলেন সেই সুযোগ। এক বেসরকারি টিভি চ্যানেলে গানের লড়াইতে পাহাড়ি প্রশান্ত তামাংকে ঘিরে যে জাত্যভিমানের প্রকাশ ঘটতে চেয়েছিল, তাকে মূলধন করেছিলেন বিমল গুরুং। সুবাস ঘিসিং লালকুঠির নিরাপত্তার বলয়ে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ায় পাহাড়ে নিজের জনজাতির আবেগকে বোঝার সেই ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাই বিমল গুরুঙের 'প্রশান্ত তামাং'-এর ফ্যান ক্লাবের বিরোধিতা করে তাকে ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। সুবাস ঘিসিং আসলে একে ভেঙে বিমল গুরুংকে খর্ব করতে চেয়েছিলেন। বিমল গুরুং ঘিসিঙের এই নির্দেশকে পাহাড়ি জনতার জাত্যভিমানের বিরোধী তথা গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের বিরোধিতা বলে পাহাড়ের ভাবাবেগকে সুবাস ঘিসিঙের বিরুদ্ধে সংগঠিত করলেন। প্রচার চালালেন, সুবাস ঘিসিং বাংলা সরকারের দালালে পরিণত হয়ে গোর্খাল্যান্ডের দাবি ছেড়ে ষষ্ঠ তপশিলে যাবার চেষ্টা করছেন। বুদ্ধদেববাবুরা সুবাস ঘিসিংকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়ে বিমল গুরুঙের এই প্রচারকেই যে আরও দানা বাঁধতে সাহায্য করছেন তা বুঝতে পারেননি। তার পরের ফল তো সবারই জানা। সে দিনের পাহাড়ের সম্রাট সুবাস ঘিসিঙের পতন আর নতুন সম্রাট বিমল গুরুঙের সাম্রাজ্য দখল।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব হচ্ছে, তিনি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর মতো পাহাড়কে তাঁর যাত্রাপথের মানচিত্র থেকে দূরে সরিয়ে

> দার্জিলিঙের অধিকাংশ মানুষই গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার গোর্খাল্যান্ড দাবির সমর্থক। যুক্তির যে পালটা যুক্তিও আছে, সেটাও কিন্তু ভাবা দরকার।

রাখেননি। বারবার এসেছেন পাহাড়ে। জানার চেষ্টা করেছেন তাদের। কতখানি জানতে পেরেছেন তা অবশ্য বিতর্কের বিষয়। তবে তিনি ধরে নিয়েছিলেন, পাহাড়ের সমস্যা জাতিসত্তার সমস্যা নয়। এই সমস্যা উন্নয়নের সমস্যা। অর্থাৎ অর্থ ঢেলে নানা উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিলে পাহাড়ের মানুষ জাতিসত্তার প্রশ্নটি থেকে ধীরে ধীরে সরে এসে সমতলের মূলস্রোতের অংশীদার হতে এগিয়ে আসবে।

চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি এতটুকু। প্রচণ্ড পরিশ্রমী রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বারবার এসেছেন পাহাড়ে। গোয়েন্দা দপ্তরের সূত্রে তিনি নিশ্চয়ই খবর পাচ্ছিলেন, বিমল গুরুঙের গোঁয়ারতুমি, তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, অর্থের অপচয়, সর্বোপরি তাঁকে ঘিরে থাকা সুবিধাভোগী স্তাবকের বৃত্ত ইত্যাদি পাহাড়ের মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করে চলেছে। মমতাদেবী যে রাজনৈতিক ক্ষুরবুদ্ধিতে তাঁর থেকেও অনেক প্রবীণ নেতার তুলনায় এগিয়ে আছেন, তাতে সন্দেহ প্রকাশের সুযোগ নেই। তিনি যে বিমল গুরুঙের সঙ্গে প্রথম দিকে একটা সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন, সেখানেও ছিল রাজনৈতিক কৌশল। প্রথমত, তিনি চেয়েছিলেন গুরুঙের সঙ্গে এই সম্পর্কের সিঁড়ি বেয়ে তিনি পাহাড়ে পা রাখবেন। তিনি গুরুংকে নানা প্রতিশ্রুতির কথার জালে এমন একটা সম্পর্কের আবেগে টেনে এনেছিলেন যে, বিমল গুরুং প্রকাশ্য জনসভায় মুখ্যমন্ত্রীকে 'পাহাড়ের মা' বলে বরণ করেছিলেন।

বিমল গুরুং এসেছিলেন সুবাস ঘিসিঙের বিরুদ্ধে গোর্খাল্যান্ড দাবিকে পরিত্যাগ করে রাজ্য সরকারের তল্পিবাহকে পরিণত করার অভিযোগকে ভর করে। বস্তুত, সুবাস ঘিসিং গোর্খাল্যান্ড দাবির আন্দোলন থেকে সরে এসে দার্জিলিংকে ষষ্ঠ তপশিলে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানালে এই অভিযোগ আরও জোরালোভাবে হাজির হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। এবার কিন্তু বিমল গুরুংও সেই সুবাস ঘিসিঙের মতন রাজ্য সরকারের যতই কাছাকাছি আসার দিকে ঝুঁকছিলেন, ততই গোর্খাল্যান্ড দাবিটি থেকে সরে যাচ্ছিলেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিমল গুরুংকে ব্যবহার করে পাহাড়ে পা রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি কোনওভাবেই তাঁকে পাহাড়ের কর্তৃত্বে রাখতে চাননি। তাই প্রথম সুযোগেই তাঁকে মঞ্চের পাশে বসিয়ে নিজেই একের পর এক প্রকল্প উদ্‌বোধন করে বুঝিয়ে দিলেন, পাহাড়ের কর্তৃত্বভার থাকবে সম্পূর্ণভাবে তাঁরই হাতে। বিমল গুরুং ব্যাপারটা বোঝার আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাহাড়ি জাতিসত্তাকে খণ্ডিত করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ ক্ষেত্রে তিনি এর সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়াকে আরও কিছু রাজনৈতিক লাভের জন্য ভাবতে চাইলেন না। পাহাড়ি জনসত্তাকে বিভেদের পরিবর্তে এক ঐক্যবদ্ধ পাহাড়ি জাতিসত্তা গড়ে তুলতে পারলে অনেক বেশি লাভজনক হত। কিন্তু সেই ইংরেজ শাসকদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির খণ্ডিতকরণের মতন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনজাতি পাহাড়ে বসবাসের মধ্যে যে একটি পাহাড়ি জনসত্তা গড়ে তুলেছিল, সেই ঐক্যে কুঠারাঘাত করলেন। ক্ষুদ্র কালিম্পংকে জেলায় রূপান্তরিত করে দার্জিলিং জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিমল গুরুঙের বিরুদ্ধে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতন হরকাবাহাদুর ছেত্রীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। লেপচা, তামাং ইত্যাদির মতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ পাহাড়ি জাতিসত্তাবোধ থেকে সরিয়ে এনে গড়ে দিলেন স্ব স্ব গোত্রের এক-একটি উন্নয়ন পর্ষদ। বিভাজনের রাজনীতির ভয়াবহ পরিণাম বাংলার বাঙালিরা নিজেদের অভিজ্ঞতায় জানে। ১৯০৫ সালে যে বাঙালি বাংলাকে অটুট রেখে এক বাঙালি জাতিসত্তার পরিচয় দিয়েছিল, সেই বাঙালিই কিন্তু মাত্র ৪২ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে হিন্দু বাঙালি ও মুসলমান বাঙালি— এই খণ্ডিত জাতিসত্তায় দেশটাকেই দ্বিখণ্ডিত করে নিল। ইংরেজরা নাগা জনগোষ্ঠীকে নানা গোষ্ঠীতে ভাগ করে দিয়েছিল তাদের সাম্রাজ্যরক্ষার স্বার্থে। আজ নাগাল্যান্ড, মণিপুরে সেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব একের পর এক বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের জন্ম দিয়ে চলেছে।

বিমল গুরুঙের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার মধ্যে যে ভাঙন ধরানো গিয়েছে তা কিন্তু মূল দাবি গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবির বিরোধিতায় নয়। এই ভাঙন ঘটেছে ব্যক্তিগত ও আর্থিক লাভ-লোকসানের জন্য। যে হরকাবাহাদুর পৃথক দল গঠন করে গত বিধানসভায় তৃণমূলের সমর্থন নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, সেই হরকাবাহাদুর ঘোষণা করেছিলেন তাঁর মূল লক্ষ্য গোর্খাল্যান্ড। বিমল গুরুং সেই দাবি আদায়ে ব্যর্থ হয়েছেন বলেই তিনি এই দল গঠন করেছেন। যাঁরা বিমল গুরুঙের দল থেকে বেরিয়ে এসে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের প্রায় কেউই গোর্খাল্যান্ড চান না— এই ঘোষণা করেননি।

এবারের পুর নির্বাচনে বিমল গুরুংরা 'পশ্চিমবঙ্গ বনাম গোর্খাল্যান্ড'— এই পোস্টার দিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁরা হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পেতে সেই গোর্খাল্যান্ডের দাবিকেই হাজির করেছেন।

মিরিক পুরসভায় তৃণমূলের বিজয়কে তৃণমূল নেতৃত্ব প্রচার করছেন, পাহাড়ের মানুষ যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের কর্মসূচিকে সমর্থন করেন— এটি তার প্রমাণ। এবার যদি বিমল গুরুং তৃণমূলের এই দাবিকে হাতিয়ার করে দাবি করেন, মিরিক জেতাকে যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীতির বিজয় বলে গ্রহণ করতে হয়, তবে দার্জিলিঙের পার্বত্য এলাকায় বাকি তিনটি পুরসভায় তাঁদের বিপুল বিজয় তো প্রমাণ করে, দার্জিলিঙের অধিকাংশ মানুষই গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার গোর্খাল্যান্ড দাবির সমর্থক। যুক্তির যে পালটা যুক্তিও আছে, সেটাও কিন্তু ভাবা দরকার।

উত্তরের রাজনীতি সচেতন মানুষ পাহাড় ভোটের সাম্প্রতিক ফলাফলের বক্র ব্যাখ্যা করেছেন— নতুন জেলা, নতুন মহকুমা, ২৫টি উন্নয়ন পর্ষদ ৩০০ কোটি খরচের পর মন্ত্রীসভার প্রায় সবাই এসে ক'টা দিন পাহাড়ে ক্যাম্প করার ফল যদি হয় মিরিকের ৬টি আসন বা পুরবোর্ড দখল একে বিজয় বলে চিহ্নিত করা কিন্তু হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। পাহাড়-সমতলের মানুষের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান তৈরি হয়ে আছে তাতে মিরিককে 'সূচনা' ভাবাটা রাজ্যের শাসকদলের পক্ষে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না!

নোটবন্দির প্রভাবে এখনও উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ এলাকায় আর্থিক সংকট চলছে

উত্তরপক্ষ

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

৮ নভেম্বর ২০১৬ তারিখটি লাল কালিতে লেখার দিন। প্রধানমন্ত্রী বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সামনে এলেন, সরাসরি দেশবাসীর উদ্দেশে বললেন, সেই দিন রাত থেকে ৫০০ টাকা এবং ১০০০ টাকার নোট অর্থ লেনদেনের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। নোটগুলো শুধুমাত্র অকাজের কাগজের টুকরো। পরদিন সারা ভারতের সমস্ত ব্যাঙ্কের পাবলিক লেনদেন বন্ধ থাকল— প্রস্তুতির জন্য। সরকারের সমস্ত আশ্বাস সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ ব্যাঙ্কে লাইন দিয়ে পুরনো নোট বদলের জন্য দাঁড়ালেন। অনেকে আবার নিজের অ্যাকাউন্টে অচল নোট জমা করার জন্য লাইন দিলেন।

কিন্তু বাজারে নোটের জোগান একদম কমে গেল। মানুষ কেনাকাটায় লাগাম টানল। ব্যাঙ্ক থেকে চাহিদা অনুযায়ী টাকা পাওয়া যাচ্ছিল না। যেসব এলাকায় যেসব ব্যাঙ্কের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চেস্ট ছিল, তারা পুরোপুরি না হলেও কিছুটা সামলেছিল। দিল্লিতে আমলারা বসে বললেন 'আজ থেকে সেভিংসে দশ হাজার এবং এটিএম-এ চার হাজার ক্যাশ পাওয়া যাবে। দেখা গেল, ব্যাঙ্কে সেভিংসে দশ হাজার নয়, দু'হাজার টাকা দিচ্ছে। এটিএম তথৈবচ। মানুষের ভোগান্তিও বাড়তে থাকল।

দিনমজুররা তাঁদের মজুরি অনিয়মিতভাবে পেতে শুরু করলেন। যাঁরা রাজ্যের বাইরে মজুরি করতেন, তাঁরা বেকার হয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। খাদ্যসামগ্রী এবং পড়াশোনার ব্যয় ছাড়া অন্যান্য খরচ কিন্তু নাগরিকরা কমিয়ে দিলেন।

সরকার ক্যাশলেস লেনদেনের পক্ষে প্রচার শুরু করল। নানারকম মোবাইল অ্যাপ চালু হল। চেক, এনইএফটি, আরটিজিএস এবং এটিএম যেমন চলছে, তেমন চলতে থাকল। তবুও আম আদমির নগদ টাকা লেনদেনের অভ্যাসে ব্যাপক পরিবর্তন হল না। মাছের দোকান, পান-সিগারেটের দোকানে বিজ্ঞাপন দেখা গেল— 'পেটিএম-এ টাকা দিতে পারেন।' এগুলো সংবাদপত্রে ছবিসহ খবর হিসেবে ঠাঁই পেল। আজকাল বড় শহরে অ্যাপ সংযোজিত ভাড়ার গাড়ি, যেমন— ওলা, উবের ইত্যাদিতে ক্যাশলেস লেনদেন চালু হয়ে গেল।

কেউ বলল, প্রায় পনেরো হাজার কোটি কালো টাকা উদ্ধার করা গিয়েছে। বহু কালো ধন পুকুরে, নর্দমায় পাওয়া গেল। ইতিমধ্যে বাজারে ৫০০ টাকা এবং ২০০০ টাকার নতুন নোট আর-একটু স্মার্ট চেহারায় হাজির হল। কিন্তু তাতে কি সমস্যা শেষ হয়ে গেল? মোটেই না।

প্রথমত, রবি মরশুমে ক্যাশ টাকা না পাওয়ায় কৃষকদের হয়রানি বহুগুণ বেড়েছে। নতুন কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলোর উৎসাহের ঘাটতি ছিল। ব্যাঙ্ক স্বনির্ভর দলগুলোকে ঋণ মঞ্জুর করেছে, কিন্তু দলের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ জোগান দিতে পারেনি। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় কৃষি ঋণ বা স্বনির্ভর দলকে দেওয়া ক্যাশ ক্রেডিট ঋণে লেনদেন ঠিকমতো না হলে লোনগুলো নন-পারফর্মিং হয়ে যায় এবং পরবর্তী ঋণ পাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়।

অধিকাংশ কর্মচারীর বেতন এখন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে হয়ে থাকে। তাঁরাও

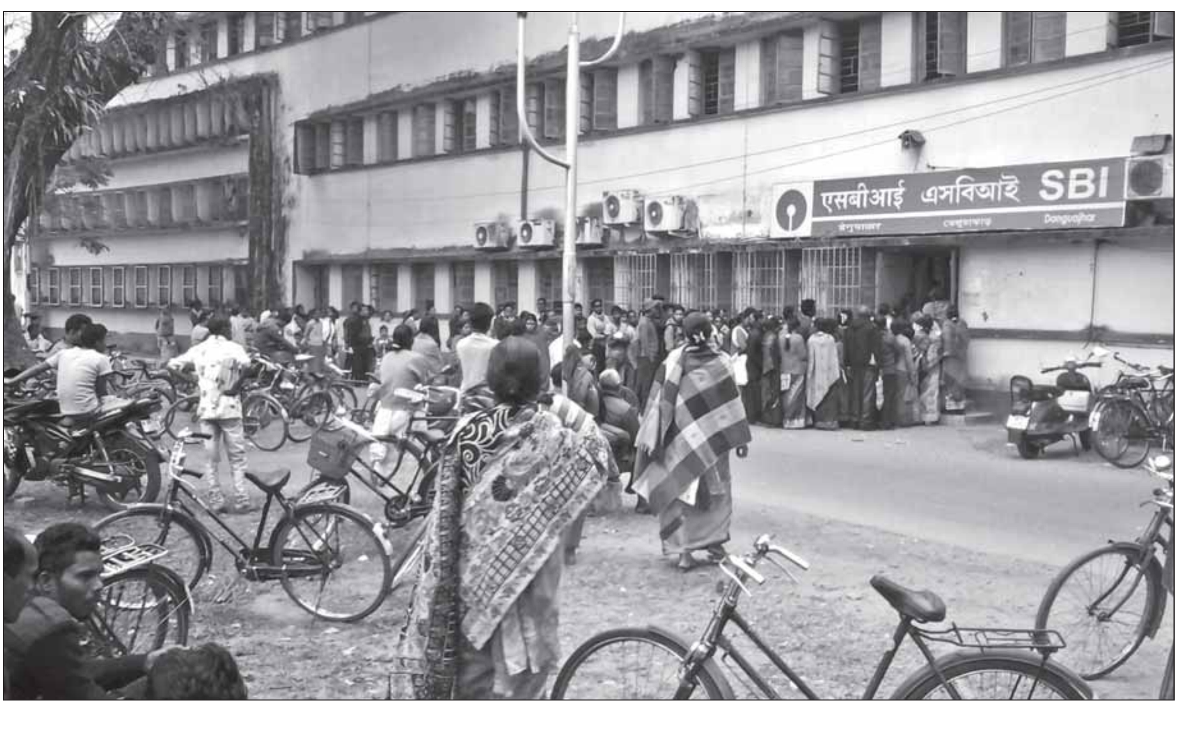

প্রয়োজনমতো টাকা ব্যাঙ্ক থেকে পাননি। সবাই আশা করেছিল, মার্চ ২০১৭-র মধ্যে নগদ টাকার জোগান স্বাভাবিক হয়ে যাবে। যদিও বেশ কিছু ব্যাঙ্ক ইতিমধ্যে অবস্থা সামলে নিয়েছে— অন্য দিকে কিছু ব্যাঙ্ক এখনও গভীর সংকটে। শুধুমাত্র ক্যাশ টাকার অভাবে।

আমরা সবাই কি অবগত আছি, ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় অর্থাৎ যাকে বলে পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক তিন ধরনের— ১) স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (২) রাষ্ট্রীয়কৃত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক (৩) রিজিয়নাল রুরাল ব্যাঙ্ক বা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে প্রথম দু'প্রকার সরকারি ব্যাঙ্ক সুবিধা পায়, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক যে পার্বলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক তা বহু সরকারি আধিকারিক এবং শিক্ষিত লোকজনও জানেন না। এর মূল কারণ প্রচারকার্যে সরকারি উদাসীনতা। সারা দেশের গ্রামীণ এলাকায় এই ব্যাঙ্ক প্রশংসার সঙ্গে কাজ করে চলেছে— গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখার ক্ষেত্রে এই ব্যাঙ্কের সীমাহীন অবদান। সাধারণত গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখা অফিসগুলো অর্থ সরবরাহ পেয়ে থাকে প্রবর্তক ব্যাঙ্ক (এসবিআই বা ন্যাশনালাইজড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক) থেকে।

এবার তাদের চরিত্রে ভিন্ন রূপ দেখা গেল। প্রবর্তক ব্যাঙ্ক হিসাবে তাদের বিধিবদ্ধ দায়িত্ব ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র নিজেদের শাখাগুলোকে অর্থ সরবরাহের কাজ করেছে। কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। গত মার্চের শেষ সপ্তাহে দিল্লি গিয়েছিলাম এক সর্বভারতীয় আন্দোলনের সমর্থনে। সেখানে দেখেছি অরুণাচল, অসম বা মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলো গভীর সমস্যায় ছিল। উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, বঙ্গীয় বিকাশ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ভীষণ লড়াই চালিয়েছে এবং এখনও তার রেশ রয়ে গিয়েছে। জলপাইগুড়িতে জেলাশাসকের সভাপতিত্বে জেলা কনসালটেটিভ কমিটির মিটিং-এ গ্রামীণ ব্যাঙ্কের আধিকারিক আবেদন জানিয়েছেন জেলাশাসককে— 'নগদ টাকার ব্যবস্থা করে দিন। আমরা গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে আরও বেশি ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করব।' জেলাশাসক তৎক্ষণাৎ লিড ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজারসহ কিছু বড় ব্যাঙ্ককে (যাদের কারেন্সি চেস্ট আছে) নির্দেশ দান করেন নগদ টাকা সরবরাহ করতে। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কিছু সিনিয়র অফিসার এবং কখনও এলডিএম গৌর চ্যাটার্জি বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে নগদ টাকা সংগ্রহের জন্য আবেদন-নিবেদন চালিয়ে যান। নগদের অভাবে ব্যাঙ্কের কিছু গ্রাহক বিরক্ত হয়েছেন, কিন্তু গ্রামীণ ব্যাঙ্ক তাঁরা ছেড়ে যাননি। নোটবন্দির ফলশ্রুতিতে কোটি কোটি অচল নোট ব্যাঙ্কে জমা পড়ে— যে অর্থ ব্যাঙ্ক ব্যবসার কাজে ব্যবহার করতে পারেনি, কিন্তু গ্রাহক সুদ পেয়েছেন। ব্যাঙ্কের লোকসান হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শহরের শাখাগুলোতে দূরান্তের শাখা থেকে নগদ টাকা নিতে গত নভেম্বর '১৬ থেকে প্রতিদিন ভিড় করেন ব্যাঙ্কের কর্মীরা। দু'-তিন ঘণ্টা পর সামান্য নগদ নিয়ে দূরের গ্রামে যে শাখা আছে, সেখানে যান, কিন্তু গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী টাকা দিতে পারেন না। কারণ জেলা বা মহকুমা শহরের শাখা পর্যাপ্ত নগদ দিতে পারেনি। প্রতিদিন ব্যাঙ্ক কর্মীরা টাকার জন্য হন্যে হয়ে দূরের শাখায় গিয়েছেন— সময় নষ্ট হয়েছে, গাড়ি ভাড়া ও রাহা-খরচের টাকা অপব্যয় হয়েছে। নতুন ঋণের কাজ ব্যাহত হয়েছে। অনুৎপাদক ঋণ আদায়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার যে ক্ষতি হয়েছে তা নিরাময় হতে সময় লাগবে।

ক্যাশলেস বা নগদহীন লেনদেনে অভ্যস্ত আমাদের দেশের দশ শতাংশ গ্রাহক। এটিএম কার্ড থাকা সত্ত্বেও তা ব্যবহারে দ্বিধা আছে বহু গ্রাহকের। এমনকি চেকে লেনদেনেও তাঁরা অভ্যস্ত নন। বিপরীতে ইউরোপ বা আমেরিকাতে মাত্র ২০ শতাংশ লেনদেন নগদে হয়। নোটবন্দি ব্যবস্থার সমর্থকরা বলছেন, দেশব্যাপী দুর্নীতি, কর ফাঁকি, জাল নোটের কারবার দেশের অর্থনীতিকে পিছনে ঠেলেছে। আবার আমাদের এলাকার অসংগঠিত শ্রমিক ও কৃষকদের কাজ বন্ধ হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মাঠে ফসল কাটা যায়নি নগদের অভাবে। ব্যাঙ্ক আধিকারিক নিবিড় রায় বলছিলেন, এখনও বহু গ্রাহক টাকা জমা দেওয়া বা টাকা তোলার ফর্ম পূরণ করতে পারে না। আমাদের এই বিপুল সংখ্যক গরিব মানুষ বৈদ্যুতিন লেনদেনের সুযোগ কি নিতে পারবেন? যেহেতু তা সম্ভব নয় তাই নগদ টাকার জোগান দিয়েই অসংগঠিত ক্ষেত্রের মানুষদের জীবন-জীবিকা চালু রাখতে হবে।

উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ব্যবসা প্রায় চার হাজার কোটি টাকা ছুঁতে চলেছে। অবসরজনিত কারণে কর্মীসংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০১৬-২০১৭ আর্থিক বছরে লাভ উল্লেখযোগ্যভাবে কম হয়েছে। এসব লক্ষণ ভাল নয়। ব্যাঙ্কটি উত্তরবঙ্গের মানুষদের একান্ত নিজেদের ব্যাঙ্ক। এটি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও নগদ টাকার অভাবে কেন ধুঁকছে, গ্রাহকরা জানতে চাইছেন। একসময় এই ব্যাঙ্কের কর্মীরাই লড়াই করে ব্যাঙ্কটিকে সব দিক থেকে লাভজনক অবস্থায় দাঁড় করিয়েছেন— এই নগদ টাকার অভাবের মোকাবিলা করতে তাঁরা সামগ্রিকভাবে ব্যাঙ্ক শিল্পের সমর্থন প্রত্যাশা করছেন, বিশেষ করে প্রবর্তক ব্যাঙ্ক থেকে।

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only

Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {18.9cm (W) X 27.07 cm (H)}, Non Bleed {15.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {15.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {7.5 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {4.8cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 15.5 cm (W) X 5.2 cm (H), 1/4 Page 7.5 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {4.8 cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2017 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

বন্ধ চা-বাগিচার ফ্যাক্টরির ভিতরের অংশ

রুখাশুখা, মৃতপ্রায় নদীগুলি বাঁচিয়ে রেখেছে ডুয়ার্সের চা-বাগিচার শ্রমিকদের

'এখন ডুয়ার্স'-এর পক্ষ থেকে চায়ের ডুয়ার্সের কোণে কোণে ঘুরে তুলে আনা জ্বলজ্যান্ত ছবি পেশ করছেন **ভীষ্মলোচন শর্মা** তাঁর ধারাবাহিক প্রতিবেদনের **সপ্তদশ পর্বে**।

চায়ের ডুয়ার্স ডুয়ার্সের চা

একসময়ে বন্ধ থাকার পর এখন খুলেছে মাদারিহাটের দলমোড় চা-বাগান। কিন্তু যে ক'টা মাস বন্ধ ছিল, মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পায়নি এই চা-বাগানও। ১৫ জন শ্রমিকের জীবন গিয়েছে অপুষ্টি, দারিদ্র, অনাহার এবং চিকিৎসার অভাবে। যদিও সরকারপক্ষ অনাহারের কথা স্বীকার করতে চায় না, তবুও বাস্তব তো চিরকালই বাস্তব। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে গত কয়েক বছরে ডুয়ার্সে সর্বোচ্চ সাতটি বাগান একটানা বন্ধ থেকেছে, কিন্তু মৃত্যু ছাড়িয়েছে শতাধিক। অথচ চা-শিল্পে কিন্তু মন্দা নেই। চা-শিল্পে মন্দা কিন্তু এসেছিল বামফ্রন্ট সরকারের আমলে। ২০০২ সাল থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত চা-শিল্পে এক মহামারির আকারে সংকট নেমে এসেছিল। বিশ্ব জুড়ে চা-শিল্পের সেই মন্দাজনিত সংকটের প্রভাবে সমগ্র দেশে ১৩৫টি চা-বাগান তখন বন্ধ হয়ে যায় এবং আমাদের রাজ্যেও বন্ধ বাগানের সংখ্যা তখন দাঁড়ায় ৩২টি। কিন্তু তখন ছিল শিল্পগত মন্দা। দীর্ঘদিন ধরে টানা ৩২টি বাগান বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও চা-বাগানের শ্রমিক পরিবারে আজকের মতো সংকট নামেনি। এই অভিজ্ঞতা বাগান শ্রমিকদেরই। আর এই অভিজ্ঞতা থেকেই চা-বাগান বন্ধ হলে রাজ্য সরকারের দায়িত্ব কতটা তা নিজের জীবন থেকেই উপলব্ধি করতে পারছে গোটা চা-মহল্লা। চলতি পরিস্থিতিতে তাই রাজ্য সরকারের উদাসীনতাকেই কাঠগড়ায় তুলেছে ট্রেড ইউনিয়নগুলি।

বন্ধ বাগানের শ্রমিকদের এ রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার দিয়েছিল বিশেষ আর্থিক সুবিধা। মাসে ৫০০ টাকা থেকে শুরু করে বামফ্রন্ট সরকার চলে যাওয়ার বছর পর্যন্ত সেই টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় দেড় হাজার টাকা। যে সময়ে বাগান বন্ধ হয়ে যেত, রাজ্য সরকার বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকপিছু বরাদ্দ করত বিশেষ বিপিএল কার্ড। এই কার্ডের বিনিময়ে হাসপাতাল অথবা বিদ্যালয়ে মিলত ছাড়। তার থেকেও বড় সাহায্য মিলত অন্ত্যোদয় যোজনায় ৩৫ কেজি চাল। বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও অনাহার নিত্যসঙ্গী ছিল বন্ধ বাগানে। বন্ধ বাগানের শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য বাগান লাগোয়া ব্লক প্রাথমিক

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের শাখা খোলা থাকত বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকমহল্লাতে। তিন দিন খুলে রাখা সেই শাখায় উপস্থিত থাকত চিকিৎসক এবং নার্স। দেওয়া হত প্রয়োজনীয় ওষুধ। চিকিৎসক অমিল থাকলে বন্ধ বাগানের জন্য ঠিকায় চিকিৎসক নিয়োগ পর্যন্ত করে রেখেছিল বিগত সরকার। বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে বন্ধ বাগানে খোলা হয়েছিল বাড়তি আইসিডিএস সেন্টার, যার ফলে শিশু ও মায়েদের শরীরে অপুষ্টি থাবা বসাতে পারেনি আগে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর বন্ধ বাগানে যেখানে বিদ্যুৎব্যবস্থা বজায় ছিল, সেই বাগানে বিদ্যুতের বিল মিটিয়ে সেখানে জ্বালানির টাকা খরচ করে সরকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল পানীয় জলের। অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে ৬০ বছর পার করা বৃদ্ধদের বিশেষ পেনশনের ব্যবস্থা ছিল বন্ধ বাগানে। এখন বাগানে পানীয় জলের জোগান নেই। বাগানে খাদ্য মেলে কি না তা নিয়ে বিবাদ, পালটা বিবাদ। পরিস্থিতি এমনই যে, মৃত্যুর পর শেষকৃত্য করার মতো অর্থ পর্যন্ত থাকে না বন্ধ বাগানের শ্রমিক পরিবারগুলোর কাছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য বলেছেন, রাজ্যে কোনও অনাহারে মৃত্যু নেই। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরগুলোও তাদের রিপোর্টে জানাচ্ছে, লিভার, রক্তাল্পতা, চর্মরোগ ইত্যাদি রোগের প্রাদুর্ভাব, তার সঙ্গে ম্যালেরিয়া বা ডেঙ্গির উপদ্রব আছে, আমি আর সঙ্গী সাংবাদিক বন্ধু পার্থ জানতে পারি, মৃত্যুর কারণ রোগে ভুগে, অনাহারে নয়। আসলে প্রাণটা যেন আটকে থাকে কোথাও। নিস্পন্দ শরীর যেন শতেক জড়তায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। স্পন্দহীন পড়ে থাকা অলস শরীর জুড়ে দাপাদাপি বাড়ে শতেক রোগের, বেঁচে থাকার জন্য মরা শরীর জুড়ে এই নিষ্প্রাণ অবস্থাই যে বড় দরকার। তবে এ কথা ঠিক, সরকার প্রদত্ত সেল্‌ফ হেল্প গ্রুপের মাধ্যমে প্রদেয় ৩৫ কেজি চাল খাদ্যসুরক্ষা প্রকল্প এবং বন্ধ বাগানে ফাউলাই প্রকল্প বাঁচিয়ে রেখেছে শ্রমিকদের।

মাইলের পর মাইল জুড়ে জীবনহীন দেহের উপর পড়ছে বেলচার ঘা। উঠে আসছে নানা আকারের পাথর। চালনিতে ফেলে সেই পাথরই ভাগ হয়ে যাচ্ছে নানা মাপে। বেলচার কোপে উঠছে বালিও। নিস্পন্দ শরীরের উপর দিয়ে ধুলো উড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে লরি। ভোর থেকে শুরু করে বিকেল গড়িয়ে যায়। নামে সন্ধ্যা। অন্ধকার নামলেই সে দিনের মতো ইতি। ফের শুরু পরের দিন। প্রাণহীন রুক্ষ প্রান্তর জুড়ে এইভাবেই চলছে প্রাণরক্ষার এক লড়াই। একদিকে ছড়িয়ে আছে চা-বাগিচা, সেই বাগানের গা ঘেঁষেই নেমে এসেছে পাহাড়ি নদী। কোথাও বা তার নাম ডিমডিমা, কেউ ডাকে রেতি নামে। কারও মুখে পাগলি, ডায়না, আরও কত কী। রুখাশুখা, প্রাণহীন, মৃতপ্রায় নদী বাঁচিয়ে রেখেছে ডুয়ার্সের চা-বাগান শ্রমিকদের। নদী যখন শুখা, প্রাণহীন, তখনই জীবন ফেরে বাগিচা শ্রমিকদের। আর পাহাড়ি বহতায় যখন জীবন আসে, তখন স্পন্দনহীন হয়ে পড়ে চা-বাগিচার জীবন।

যখন মাসাধিককাল ধরে বন্ধ পড়ে থাকে ডুয়ার্সের দলমোড় চা-বাগান, তখন সেখানেও বাঁচার অক্সিজেন জোগায় পাহাড়ি নদী। ডুয়ার্স যাকে চেনে পাগলি নামে। বীরপাড়া থেকে গুয়াহাটিগামী জাতীয় সড়কের নীচ দিয়ে তার চলার পথ। সমান্তরালভাবে তার পথে আছে আলিপুরদুয়ার পথের রেল সেতুও। পাগলির চলার পথের ধারে দেখা হল এদের সঙ্গে। সকাল গড়িয়ে বেলা বাড়ছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে নদীর পাড়ের জটলা ক্রমে ক্রমে উদাস হয়ে পড়ে। জাতীয় সড়ক থেকে নদীপথে ধুলো উড়িয়ে লরি নামলে ভিড় কেমন যেন ছটফটিয়ে ওঠে। ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা ডায়না, তোর্সা, জলঢাকা নদী জুড়ে বালি আর পাথর। কোথাও বা একেবারেই ক্ষীণকায় জলের প্রবাহ। চড়া রোদে নদীগুলোর বুক জুড়ে শুধু পাথর ভাঙার শ্রমিক। বন্ধ চা-বাগিচার শ্রমিকদের ভিড়। উত্তরের তরাই এবং ডুয়ার্সের আবহাওয়ার ক্রমপরিবর্তন ঘটছে। এর প্রভাব প্রতিনিয়তই পড়ছে কৃষি এবং চা-বলয়ে। একেবারেই রুখাশুখা মরশুম। অথচ চা-বাগিচার পাতা রক্ষার জন্য একটু বৃষ্টি না হলে চা-পাতার গুণমানে প্রভাব পড়বে। তবে সব বাগানে সেইভাবে সেচ দেবার ব্যবস্থা নেই। ডুয়ার্সের গভীরে বেশ কিছু বড় বাগানে সেচ দেবার মোটামুটি ভালই ব্যবস্থা আছে। অন্য দিকে নদীনালা, পুকুর শুকিয়ে যাওয়ায় কৃষিক্ষেত্র এখন অনেকটাই বিপন্ন। ঢেকলাপাড়া চা-বাগানের শ্রমিক মংরু ওঁরাওয়ের কোনও কাজ নেই। একমাত্র মেয়ে রক্তাল্পতায় ভুগছে। পয়সার অভাবে ওষুধ জোটে না, লেখাপড়া বন্ধ। এক বৃষ্টির দিনে মংরুর ঘরে গিয়েছিলাম। ঘরের চারদিকে মশারির মতো করে প্লাস্টিক লাগানো। ছাদ ফুটো হয়ে গিয়েছে। ভেঙে পড়েছে বাড়ির চারধার। জঙ্গলে পরিণত। অসহ্য এক কষ্ট। কারখানা বন্ধ, তেমন কোনও কাজ নেই। নিদারুণ দারিদ্র বেশিক্ষণ সহ্য করা যায় না, অনিবার্য মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করে এলাম। বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের দুর্দশা নিয়ে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের অবশ্য বক্তব্য, মানবিকতা লঙ্ঘনের আইনি ব্যাখ্যায় এসব নাকি পড়ে না। ডুয়ার্সের হান্টাপাড়া চা-বাগিচার লোটো ঘাড়িয়া জন্ডিসে ভুগছিলেন। বিনা চিকিৎসায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বীরপাড়া চা-বাগিচার দু'নম্বর বিজলি লাইনের বাসিন্দা বুদি কুজুরের শরীরের এক প্রান্ত পক্ষাঘাতে আক্রান্ত। বীরপাড়া সাধারণ হাসপাতালে ভরতি করা হলে অবস্থার আরও অবনতি হয়। ডাক্তারেরা তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে রেফার করেন। কীভাবে নিয়ে যাবে? টাকা নেই। বাড়িতেই ফিরিয়ে নিয়ে আসতে বাধ্য হল। তারপর থেকে বিনা চিকিৎসায় ঘরেই পড়ে ছিলেন। বুদি কুজুরও শেষ পর্যন্ত মারা যান। ছেলে সুধীর কুজুরকে জিজ্ঞাসা করি, মাকে কেন এভাবে ফেলে রাখলে? সুধীরের বক্তব্য, 'দু'বেলা খাবারের ব্যবস্থা নেই ঘরে। সেখানে অসুস্থ মাকে দেখব কেমন করে? তাই চোখের সামন তিলে তিলে মরতে দেখলাম মাকে। কিছুই করতে পারলাম না।' বুদিকে নিয়ে গত কয়েক মাসে বীরপাড়া চা-বাগানে ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। হান্টাপাড়া চা-বাগানে রোগে ভুগে ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। সরকারি ঘোষণা আছে। টাকা বরাদ্দ আছে। কিন্তু যার প্রয়োজন, তার কাছে সরকারি চাল পৌঁছায় না। পৌঁছালেও তা খাবার উপযুক্ত নয়। চিকিৎসা পেতে গেলে দূরে যেতে হয়। তার জন্য রাস্তায় খরচ করার মতো কোনও অর্থই নেই। এমন ঘটনা ইতিপূর্বেও ঘটেছে। ২০০৬-২০০৭ সলে মুজনাই চা-বাগানে বহু শ্রমিক মারা গিয়েছিল। এমন ঘটনাও আছে, যেখানে সাত দিন অনাহারে কাটানোর পর দুই মাসের শিশুকে বিক্রি করে দিয়েছেন মা। যদিও বেসরকারি সংবাদের সত্যতা স্বীকার করে না সরকারপক্ষ।

> 'দু'বেলা খাবারের ব্যবস্থা নেই ঘরে। সেখানে অসুস্থ মাকে দেখব কেমন করে? তাই চোখের সামন তিলে তিলে মরতে দেখলাম মাকে। কিছুই করতে পারলাম না।' বুদিকে নিয়ে গত কয়েক মাসে বীরপাড়া চা-বাগানে ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এভাবেই মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে বাগিচাক্ষেত্রে। ভারতীয় সংবিধানের ৩৯০ (এ) অনুচ্ছেদে বলা আছে, নাগরিকরা যাতে সুস্থভাবে জীবনযাপন চালাতে পারে, সেটা রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে। একজন নাগরিক আর্থিক বা অন্য প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে যাতে যথোপযুক্ত বিচার পায় তা রাষ্ট্রকে সুনিশ্চিত করতে হবে। তবে কেন

শ্রমিক তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত রয়ে যাবে? কারখানা বন্ধ করার কারণ যা-ই থাক, হতেই পারে মালিক আর চালাতে পারছেন না। সেটা ঠিক না বেঠিক, সেসব পরের কথা। কিন্তু আইন মেনে সমস্ত শ্রমিককে তাঁদের প্রাপ্য অর্থ বা ক্ষতিপূরণ কেন দেওয়া হবে না? হাজার হাজার বন্ধ কারখানায় এ জিনিস ঘটলেও সরকার কেন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়ে আইনি দায়িত্ব, সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা পালন করে না? শ্রমিকরা কারখানা, সংস্থা, বাগান বন্ধে অর্ধাহারে-অনাহারে মৃতপ্রায় রয়েছেন। যেন মড়ক লেগেছে। এত বড় দেশ, এত এত টাকা কারণে-অকারণে খরচ হয়। এসব মানুষের জন্য একটু মাথা গোঁজার ভদ্রস্থ ব্যবস্থা, দু'বেলা পেট পুরে খাবার ব্যবস্থা, শিশুদের দুধ, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা যায় না?

২০০৫ সাল থেকে বন্ধ ঢেকলাপাড়া চা-বাগান। বাগানের দেড় হাজার স্থায়ী-অস্থায়ী শ্রমিকদের ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু মাঝেমধ্যেই অত্যন্ত অনিয়মিত হয়ে পড়ে ভাতা প্রদান। ফলে আধপেটা খেয়েই দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন শ্রমিক পরিবারের সদস্যরা। ৭ জনের মৃত্যু ছাড়াও অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগছেন আরও ১৫ জন। যখনই মৃত্যুর খবর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তখনই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন, পৌঁছে যায় মেডিক্যাল টিম। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় চাল এবং শুকনো খাবার। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, আগেও শ্রমিকের মৃত্যুর পর চাল বিলি করেছিল প্রশাসন। কিন্তু কিছুদিন চলার পর বন্ধ হয়ে যায় চাল বিলি। ফলে ফের দুর্ভিক্ষের গ্রাসে চলে যায় ঢেকলাপাড়া চা-বাগিচার লেবার লাইন। বন্ধ চা-বাগিচায় কাজ নেই বাগিচা শ্রমিকদের। খাবারের জোগাড় করতে তাই নিষ্প্রাণ নদীখাতকেই বেছে নিয়েছেন ঢেকলাপাড়া, বীরপাড়া, তুলসীপাড়ার শ্রমিকরা। মৃতপ্রায় নদীই এখন বাগিচা শ্রমিকদের জীবনরেখা। দিনভর নদীখাতের পাথর ভেঙেই চলে দু'মুঠো অন্ন জোগাড়ের লড়াই।

নভেম্বর থেকে মার্চ— এই পাঁচ মাস শুখা নদীই বাঁচিয়ে রেখেছে ঢেকলাপাড়া চা-বাগিচার বস্তিকে। বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা ঢেকলাপাড়া বাগানই শুধু নয়, ডুয়ার্সের চা-বাগিচা এলাকা জুড়ে বন্ধ কি খোলা সব চা-বাগান বস্তি থেকেই কাজ না-পাওয়া শ্রমিক পরিবারের ভিড় বাড়ছে শুখা নদীতে। বয়সের কোনও বালাই নেই। ছেলে, বুড়ো সবাই এখন মরা নদীতে পাথর ভাঙে। 'এই নদী আমাদের ভবিষ্যৎ। বেঁচে থাকার জন্য শুখা নদীই আমাদের জীবন দিচ্ছে।' বলেছিলেন ঢেকলাপাড়া চা-বাগানের শ্রমিক

হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত জয়বীরপাড়ার শ্রমিকেরা। বান্দাপানি বাগানে পাতা তুলে ৫-১০ টাকা কেজিতে বিক্রি করা হচ্ছে। বাগানের হতভাগ্য শিশুরা।

সুখদেব ওঁরাও। ঢেকলাপাড়ার বন্ধ চা-বাগান থেকে সকাল হলেই মেয়েরা বেরিয়ে পড়েন চা-ফুলের খোঁজে। বন্ধ চা-বাগিচায় এখন পাতা তোলার কাজ নেই। দু'টি পাতার মাঝের কুঁড়ি এখন তাই ফুল ফোটাচ্ছে। এই চায়ের ফুলই তুলে নিয়ে আসার জন্য চা-বাগানে সকাল থেকেই ভিড় মেয়েদের, আর ছেলেরা যায় নদীতে। কারণ রুখাশুখা নদীতেই এখন কাজ। সারা সপ্তাহ কাজ হয় নদীতে। এমনকি রবিবারেও রেহাই নেই। ভোর পাঁচটায় কাজে যাওয়া, বিকেল চারটে পর্যন্ত কাজ, মাঝে বাড়ি ফেরা। জানালেন ঢেকলাপাড়া চা-বাগানের নেপানিয়া ডিভিশনের রমেশ খেড়িয়া। সপ্তাহভর কাজ করে রোজগার কত? 'সপ্তাহে ৪০০ টাকা হয় ৭ দিনে।' কাজের ফাঁকে জানান বন্ধ বাগিচার এক শ্রমিক।

প্রায় সপ্তাহকালব্যাপী অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে আমি এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং সমাজসেবী বন্ধু সার্ভে করতে গিয়ে বুঝলাম, ডিমডিমা নদীই জীবন দিয়েছে ঢেকলাপাড়াকে। এই রুখাশুখা নদী যখন আবার জীবন ফিরে পায়, তখন মৃত্যু যেন চেপে ধরে নেপানিয়ার শ্রমিক বস্তিকে। পাথর তখন জলের তলায়। কাজ হারিয়ে যায় স্রোতের টানে। বর্ষার নদী তখন প্রলয় নিয়ে ফিরে আসে। ডুবে যায় মহল্লা। ভাঙনের ছোবল তখন আছড়ে পড়ে চা-বাগিচা শ্রমিকের ঘরে ঘরে। কাজের চিন্তার থেকে অস্তিত্বরক্ষার লড়াইয়ে নামতে হয় চা-বাগিচা শ্রমিকদের। কাজের সময় কখনও সখনও ধেয়ে আসে জলস্রোত। পাহাড়ি নদীর এই পাগলামির কথা তো সব থেকে ভাল জানেন এই সকল শ্রমিক। চাল, ডাল কিনে নদীর পাড়ে রেখে কাজ করছিলেন মণিরাম মুন্ডা। তাঁর অভিজ্ঞতা জানালেন মণিরাম, 'চাল, ডাল খরিদ করে রাখলাম, নদীতে সেটাও বহিয়া গেলাক্।' রমেশ খেড়িয়ার সংযোজন, 'জুলাই মাসে হঠাৎ করে বান এসে সাইকেল ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল। হঠাৎ করে এমন বান আসবে, কাউকে কিছু জানতেও দেয় না নদী।' তবুও এই নদীকে বাঁচার সঙ্গী করে দিন গুজরান করার স্বপ্ন দেখেন বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকরা। নিষ্প্রাণ নদী প্রাণ বাঁচাচ্ছে চা-বাগিচা শ্রমিকদের। ডিমডিমা আর রেতি ঘিরে রেখেছে ঢেকলাপাড়া চা-বাগানকে। শুখা মরশুমে নদীখাত বাঁচিয়ে রাখার রসদ জোগায় বাগিচা শ্রমিকদের। অনাহারে মৃত্যুর তালিকা আর যাতে দীর্ঘ না হয়, সেই লড়াইয়ে কিঞ্চিৎ অবদান যেন রাখতে চায় পাহাড়ি নদীও।

ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে করতে পৌঁছাই ডিমডিমার ধারে। শ্রমিকদের ভিড়। 'আমাদের নদীতে কাজ। গাড়ি এলে কাজ করি, না থাকলে নয়।' জানায় ভিড়টা। সবাই যুবক। এ দিন বেলা গড়িয়ে গেলেও দেখা নেই লরির। তাই সকাল থেকে জমাট বাঁধা ভিড়টা ক্রমেই পাতলা হয়ে গিয়েছে। ভোর পাঁচটা থেকে শুরু হয় লরি আসা। ঝিংকু

চিকবরাইক তাই বলে, ‘সকাল থেকে অপেক্ষা করেও এখনও জোটেনি কোনও কাজ। লরি আজ খাদানেই নামেনি। যাও বা দু’-একটা এসেছে, তাদের সঙ্গে নিজেদের লোকজন ছিল। ওরা শুখা নদী থেকে বালি তুলে নিয়ে ভরতি করে লরিতে। লরি এলে তবেই জোটে কাজ। ভাত চড়ে উনানে। সেই লরিরই দেখা নেই।’

গোপালপুর চা-বাগিচার শ্রমিক পরিবারের ছেলে রমেশ ওঁরাও মাধ্যমিক পাশ। ১৯৯৭ সালে শিশুবাড়ি হাই স্কুল থেকে তাঁর প্রথম বড় পরীক্ষায় পাশ করা। বালি খাদানের কাজে এলেও তাঁর এখনও মনে আছে স্কুলের কথা। বাবা-মায়ের সঙ্গে ন’জনের সংসারে আর পড়াশোনা চালাতে পারেননি আদিবাসী এই যুবক। ‘একবার প্রাইমার স্কুলের চাকরির পরীক্ষায় বসেছিলাম, আমার হয়নি। আমার তো টেরাইবাল সার্টিফিকেট নাই, তাই হয় নাই।’ ট্রাইবাল সার্টিফিকেট নেই কেন? প্রশ্ন করি। ‘ফরম ফিল আপ করে পঞ্চায়েতের সই, মাধ্যমিকের কাগজ, সার্টিফিকেট দিয়ে জমা দিছিলাম, কিন্তু সরকারের মাডাম বললেক, জমির পাট্টা লাগবে, না হলে মিলবে না। আমিও আর চেষ্টা করি লাই।’ আদিবাসী পরিবারের এই যুবক এখন বালি খাদানের শ্রমিক। শান্তিরাম কুজুরের কাছ থেকে জানতে পারলাম, চা-বাগান থেকে আশপাশের বস্তিগুলোর ছেলের দল সকাল সকাল চলে আসে নদীতে। লরিপিছু ছয় থেকে সাতজন শ্রমিক। বালি চাইলে মিলবে বালি। পাথর চাইলে পাথর। শুখা নদীর বুক ছেঁচড়ে লরি বোঝাই করার পর মিলবে বাঁচার রসদ টাকা। বালি ভরতি করলে ৩০০ টাকা, পাথর ভরতি করলে ৩৫০ টাকা। লরিপ্রতি ৬ জন থাকলে দিনে রোজগার ৫০ টাকা। সংখ্যাটা ৭-৮ হলে মাথাপিছু রোজগারও কমে যায়। কখনও কখনও আয় হয় দিনে ২০ টাকাও। বলার সময় কোনও আড়ষ্টতা নেই, জীবনযন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে সবই যেন সয়ে গিয়েছে। বরং নদী শুখা থাকার জরুরি প্রয়োজনের কথাটা আবার স্মরণ করিয়ে দেন শ্রমিকরা। শান্তিরাম কুজুর বলেন, ‘নদী শুখা থাকলেই আমাদের চার মাস কাজ হবে।’ তারপর কী? প্রথমে বীরপাড়ার গঞ্জে রাজমিস্ত্রির কাজ। তারও পরে খোলা দিল্লি, কেরালা যাবার দরজা। ‘এখন তো ভিড় কম। নদীতেও কাজ কমছে। তাই পঞ্চাশ ভাগ ছেলেছোকরাই চলে গিয়েছে কেরালায়।’ জানান রমেশ ওঁরাও।

দলগাঁও চা-বাগিচার ডাঙাপাড়া বস্তি, বীরপাড়া চা-বাগানের বিরো লাইন, ৫ নং গোপালপুর চা-বাগিচার হরিপুর বস্তি ছাড়িয়ে মালঙ্গি, কলাইবাড়ি থেকে যুবকের ভিড় শুখা নদীতে পাথর ভাঙার কাজে। ‘আগে লেবার কম ছিল। এখন দুনিয়ার লেবার। সকালবেলা এলে ভিড়টা দেখতে পেলে বুঝতে পারতেন। চা-বাগানে কাজ নেই। ভিড় তাই নদীতে।’ বললেন দিলরঞ্জন এক্কা। শুখা নদীর উৎসমুখের দেড় কিলোমিটার এলাকা নিয়ে দিলরঞ্জন এক্কাদের মতো নয়জন ব্যবসায়ীর পাথর ভাঙার সিন্ডিকেট। এই দেড় কিলোমিটার এলাকাতেই রাখা আছে ১৮-১৯টা চালনি। চালনিপিছু ২-৩ জন করে লেবার। এর সঙ্গে বড় পাথর ভেঙে ছোট করার কাজে আরও অন্তত ৫০ জন। বালির শ্রমিক আলাদা। সবই চলছে নদীখাতের রুক্ষ প্রান্তরে। মরা নদীর বুকে এ এক বিচিত্র কর্মসংস্থান। ‘জব লস গ্রোথ’-এর ছায়া পড়ছে এঁদের কাজেও। এক দশকেরও আগে এক বন্যায় তুলসীপাড়া চা-বাগানের কাছে বাঁধ ভেঙে বদলে যায় পাগলির গতিপথ। ‘পাগলির জল সব এখন মুজনাই দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। যখন জল আসত, তখন পাথর আসত। এখন কোনও মাল আসছে না।’ বলছিলেন সিন্ডিকেট সদস্য বুবলাই সাহা। সরকারকে রয়্যালটি দিয়ে ব্যবসা করা সিন্ডিকেট এখন চাইছে বন্যা। পাগলির হারানো স্রোত ফিরে পাওয়া মানুষের দুর্ভোগের চেয়েও তাঁদের কাছে অনেক বেশি জরুরি। সংকট তাই ক্রমশ তীব্র হচ্ছে চা-বাগানে। যন্ত্রণা বাড়ছে চা-বাগানে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যেও।

জীবনযন্ত্রণায় দীর্ণ বাগিচা শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বললে আর কোনও রোমান্টিসিজম স্পর্শ করে না মনকে। ঘরের দেওয়ালে টাঙানো চা-বাগানের পাতা তোলার ছবি দেখে আর যেন ধরা পড়ে না খুশির রেশ। চা-বাগানের বুক চিরে চলে যাওয়া চলন্ত ট্রেন থেকে বাগানের পাতা তোলার দৃশ্য দেখলে এখন যন্ত্রণাবিদ্ধ মুখগুলোর কথাই যেন সামনে চলে আসে। এই মুখগুলোরই একজন শুকুরমণি মুন্ডা। সকাল ৮টা থেকে বেলা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত বীরপাড়া বাগানে চা-পাতা তোলার কাজ করেন শুকুরমণি। মাঝে বাড়ি ফিরে ফের ১টা থেকে ৪টে পর্যন্ত কাজ। সারা মাস কাজ করার পর চলতি মাসে মোট কত বেতন পেয়েছেন? হিসাব-টিসাব করে শুকুরমণি জানালেন, হপ্তা পেমেন্টের পর দুই দফায় মোট ১২৭০ টাকা হাতে পেয়েছেন। চা-বাগানের মজদুর লাইন থেকে প্রায় ৫ কিমি পর্যন্ত পথ হেঁটে বাগানে যেতে হয়। বিপদ আছে হাতির। কোয়ার্টার দিচ্ছে না কোম্পানি। নিজেরাই হাত লাগিয়ে এখন বানিয়ে নিচ্ছেন ঘর। বাড়িতে স্বামী শিবলাল ওঁরাও নিজেও চা-বাগানের অস্থায়ী শ্রমিক। তিন ছেলে আর মেয়ে সকলেই পড়াশোনা করে। চা-বাগানের রোজগারে দিন চালানোই এখন কষ্টের।

জীবনযন্ত্রণায় দীর্ণ বাগিচা শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বললে আর কোনও রোমান্টিসিজম স্পর্শ করে না মনকে। ঘরের দেওয়ালে টাঙানো চা-বাগানের পাতা তোলার ছবি দেখে আর যেন ধরা পড়ে না খুশির রেশ।

চা শ্রমিকদের নগদ মজুরি এবং বেতন দেশের সংগঠিত শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে সর্বনিম্ন। মজুরি বাবদ প্রাপ্য রেশন সামগ্রী, জ্বালানি পাওয়ার ক্ষেত্রে মালিকপক্ষ তৈরি করে রেখেছে এক চরম অনিশ্চয়তা। চা-বাগিচার অভ্যন্তরে বসবাসকারী শ্রমিকসহ বিপুল সংখ্যক অস্থায়ী শ্রমিক ও অ-শ্রমিক পরিবার, যারা চরমভাবে আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর অংশ, তাদের বসবাসের উপযোগী জমির অধিকার ও সরকারি প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বাগানের ক্রমবর্ধমান শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত যুবক-যুবতীদের জীবনে তীব্র বেকারত্ব এবং উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাবজনিত পটভূমিতে বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কর্মসংস্থানের অভাবে উঠতি বয়সের কর্মক্ষম যুবক-যুবতীদের কাজের সন্ধানে ভিন রাজ্যে প্রস্থান বন্ধ করতে হলে বিকল্প কর্মসংস্থান একান্তই জরুরি। নারী এবং কিশোর-কিশোরী পাচারের মতো ভয়ংকর ব্যাধিকে কড়া হাতে দমন করা প্রয়োজন। শিক্ষার পরিকাঠামো সংস্কারের পাশাপাশি কারিগরি এবং পেশাগত শিক্ষা কাঠামোর প্রসার ঘটানোর প্রয়োজন। জনজাতিগত শংসাপত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারি ব্যবস্থার শিথিলতাকে কাটিয়ে আরও দ্রুতগামী হওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে সুনিশ্চিত করা। চা শ্রমিকসমাজের বিভিন্ন জনজাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশের মাধ্যমেই খুঁজে পাওয়া যেতে পারে সংকট থেকে বার হওয়ার পথ। তবে তরাই-ডুয়ার্সের বাগানে জাতিসত্তার পরিচয়কে সামনে এনে পোঁতা হচ্ছে বিভেদের বীজ। বিভেদ বাড়লে বিপদ যে তাঁদেরই, এখন বুঝছেন বাগিচা শ্রমিকরা। তাই চলছে নতুন করে সংগঠিত হওয়ার পালা। সমস্যাকে মোকাবিলা করার সাহস তৈরি হচ্ছে চা শ্রমিকমহল্লায়। সেই চ্যালেঞ্জ নিয়েই এগতে চান বাগিচা শ্রমিকরা।

নকশালবাড়ি ৫০

পঁচাত্তরের পবন সিংহের আজও বিশ্বাস বিপ্লব একদিন আসবে কৃষকের লাঙলেই

কম্পিউটারের মাউস দিয়ে বিপ্লব আসবে না, বিপ্লব আসবে লাঙল দিয়েই। আর এই পঁচাত্তর বছর বয়সেই নকশালবাড়ির পবন সিংহ মনে করেন, দেশের বুকে একদিন কৃষক বিপ্লব হবেই। সমাজতন্ত্র একদিন আসবেই।

যাঁরা নকশালবাড়ির আন্দোলন নিয়ে একটু খবরাখবর রাখেন, তাঁরা হয়ত শুনে থাকবেন পবনের নামটি। ১৯৬৭ সালের ২৫

মে নকশালবাড়ির বেঙ্গাই জোতে এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল। তাতে পুলিশের গুলিতে আটজন মহিলাসহ এক যুবক ও দুই শিশু নিহত হয়। তার আগের দিন অর্থাৎ ২৪ মে নকশালবাড়িরই হাতিঘিষার কাছে ঝরুজোতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছিল কৃষকদের। তখন জমিদারদের গুন্ডাদের বিরুদ্ধে কৃষকরা একত্রিত হয়ে বিদ্রোহ শুরু করেছিলেন। কৃষকদের কষ্টের ফসল জমিদাররা তাদের গুন্ডাবাহিনী দিয়ে লুঠ করে নিয়ে যেত। তাই শ্রেণিশত্রুদের খতম করো, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো— এই ভাবনাতে নকশালবাড়ির ঝরুজোতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। সেই সময় এক আদিবাসী আন্দোলনকারী গর্ভবতী মহিলার পেটে লাথি দেয় পুলিশ। কৃষকরাও তখন পালটা তির দিয়ে সংঘর্ষ করে। তাতে পুলিশ ইনস্পেক্টর ওয়াংদি তিরবিদ্ধ হয়। উভয় পক্ষে অনেকে আহত হন। পরদিন বেঙ্গাইজোতে সেই পরিস্থিতি আরও অগ্নিগর্ভ হয়। ঝরুজোতের ঘটনার প্রতিবাদে সেখানে মেটি নদীর ধারে এক কৃষক জমায়েত হচ্ছিল। আর তখনই পুলিশ সেখানে আচমকা হামলা চালায়। তাতে ধনেশ্বরীদেবীসহ আটজন রমণী মারা যান। পুলিশের গুলিতে মারা যায় এক যুবকসহ দু'জন শিশু। ১৯৬৭ সালের ২৫ মে-র সেই ঐতিহাসিক দিনকে

কোচবিহার থেকে কালিম্পং

স্মরণ করে পরবর্তীতে সেই বেঙ্গাইজোতে শহিদ বেদি তৈরি হয়। প্রতি বছর ২৫ মে এলেই নকশালপন্থীরা তাই অন্যভাবে স্মরণ করে সেই শহিদদের। পুলিশের গুলিতে সে দিন যে মহিলারা মারা যান, তাঁদের মধ্যে একজনের ছেলে পবন সিংহ। পবনের বয়স তখন পঁচিশ বছর। তার বাবা প্রহ্লাদ সিংহও সেই আন্দোলনে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে যুক্ত হন। সে দিনের সেই ঘটনার কথা জানাতে গিয়ে বেঙ্গাইজোতের বাড়িতে বসে বৃদ্ধ পবন বলেন, 'আমরা কৃষিকাজ করতাম। কিন্তু আমরা সকলে বিদ্রোহে শামিল হই। লক্ষ্য ছিল কৃষকসমাজ প্রতিষ্ঠা করা। জমিদার বা পুঁজিবাদকে ধ্বংস করা। প্রয়াত নকশাল নেতা চারু মজুমদারের আহ্বানে আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে নেমেছিলাম। আমরা বিশ্বাস করতাম সমাজতন্ত্রে। আজও বিশ্বাস করি, সমাজতন্ত্র একদিন আসবে।' তবে আজকের প্রজন্ম যেভাবে সব লাঙল ছেড়ে কম্পিউটার মাউসে ডুব দিয়েছে, তাতে কিছু হবে না বলেই মনে করেন পবন।

১৯৬৭ সালের সেই বিদ্রোহের সময় পবনদের পঞ্চাশ বিঘা জমি ছিল। সেখানে তাঁরা চাষবাস করতেন। আজ সময়ের নিয়মে পবনদের জমিজমা হয়ে দাঁড়িয়েছে দু' বিঘা। ভোটার কার্ড থাকলেও পবন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন না। যদিও তাঁর পরিবারের সদস্যরা ভোট দেন। তিনি বলেন, 'ভোট দিয়ে সমাজতন্ত্র আসবে না। চারু মজুমদার বলতেন, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ আর আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে লড়াই চালাতে হবে।' কিন্তু নকশালপন্থীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেওয়ায় আজ শ্রমিক-কৃষক সংগ্রামী মঞ্চের মাধ্যমেই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। তাঁর

নকশালবাড়ির শহিদ পরিবারের সদস্য পঁচাত্তর বছরের পবন সিংহ

নকশালবাড়ির আবেগ (যদি কিছু অবশিষ্ট থেকে থাকে) নিয়ে ফয়দা তুলতে চায় আজকের সবকটি রাজনৈতিক দল?

তিন ছেলে, পাঁচ মেয়ে আর নাতিনাতনি মিলিয়ে তাঁরা মোট এগারোজনের পরিবার। আর্থিক সমস্যা থাকলেও বিপিএল তালিকায় তাঁদের নাম নেই। পবন পান না বার্ধক্যভাতাও। কোনওমতে মোটা ভাত, মোটা কাপড় তাঁদের হয় ছেলেদের জনমজুরির মাধ্যমে। তারপর তাঁর এক নাতির ব্রেন টিউমারের চিকিৎসা করাতে গিয়ে জমিজমা বিক্রি করে আর্থিক দৈন্যদশা আরও প্রকট হয়েছে। তবুও পঞ্চায়েতের কাছে গিয়ে পবন বিপিএল তালিকায় নাম ওঠানো বা বার্ধক্যভাতা প্রদানের জন্য তদবির করেননি। এখনও মনের মধ্যে জেদ রেখে দিয়েছেন, সেই জেদ সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই।

তাঁর বুকে প্রায়ই ঠাঁই করে নিচ্ছে প্রয়াত বিশিষ্ট নকশাল নেতা, সমাজতন্ত্রের বই আর চারু মজুমদারের কিছু বই। এই বৃদ্ধ বয়সে কোনও কাজ না থাকলেও নকশাল বিপ্লবীদের বই পড়েই মগজকে শান দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ১৯৬৭ সালের নকশাল আন্দোলনে অংশ নেওয়া পবন। তিনি প্রয়াত বিশিষ্ট নকশালদের কথা স্মরণ করে আউড়ে যেতে থাকেন, রক্তচোষার উসকানিতে মরণ যদি আসে, সেই মরণ ভার দেখে পাখির পালক হাসে। মুক্ত স্বাধীন ভারত গড়তে গিয়ে মরণ যদি হয়, তাহার ভারে পাহাড় হিমালয়। আগামী ২৫ মে নকশালবাড়ি আন্দোলনের পঁচিশ বছর দুনিয়ার সব নকশালপন্থী স্মরণ করবেন। পবনও তাতে শামিল হবেন। কিন্তু তিনি বলতে থাকেন, গ্রামে গ্রামে কমিটি গড়ে লড়তে হবে। নইলে আজ তিনি লড়ে লড়ে যেভাবে জমিহারা হয়েছেন, একদিন আরও অনেক কৃষক, শ্রমিকের সেই অবস্থা হবে। তবে তাঁর আরও কথা, 'এখন সকলে শিক্ষার দৌলতে চাষবাস ছেড়ে মাউসে ডুব দিলেও আমার বাড়িতে এখনও মাউসই নয়, লাঙলই প্রধান কথা।'

বাপি ঘোষ

Hotel Yubraj & Restaurant Monarch

(Air Conditioned)

Room	Single	Double
Super Deluxe (Non AC)	Rs 650	900
Deluxe AC	Rs 990	1200
Super Deluxe AC	Rs 1100	1300
VIP Deluxe AC	Rs 2000	2000
Suite	Rs 3000	3000
VIP Suite	Rs 3500	3500
Extra Occupancy on (Non AC)	Rs 100	---
Extra Occupancy on (AC)	Rs 200	---

N.B. Tax as per applicable

Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar, (W.B.)
Tel: (03582) 227885 / 231710
email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubraj.com

দেবপ্রসাদ রায়

এই পর্বে লেখক তুলে এনেছেন বিশদফা কর্মসূচির আলোকে এক প্রশিক্ষণের কাহিনি। টানা ছ'বছর একের পর এক দলকে দেওয়া এমন এক প্রশিক্ষণ, যা তথাকথিত 'অকম্মা'দের দলের সৈনিক করে তোলার পাশাপাশি স্বাবলম্বী করে তুলতে পারে। লেখক মনে করেন যে, এই কাজটিই ছিল দলের প্রতি তাঁর প্রথম এবং নিজস্ব অবদান। আজও গোটা দেশের প্রতিটি জেলাতে তিনি যে একটি-দু'টি সাথি খুঁজে পান, তার কারণ সেই প্রশিক্ষণ। রাজীব গান্ধি বলেছিলেন যে, অর্থের অভাব হবে না, কিন্তু পাশে পাওয়া যাবে না কাউকে। লেখক কি তবে একাই লড়ে গিয়েছিলেন সে দিনগুলিতে?

।।৩৩।।

প্রবাসী ভারতীয় নতুন প্রজন্ম কত সংকটে ভুগছে, তার উপর আমার লেখা নোট (Crisis of identity) কেউ পড়ুক বা না পড়ুক, বিশদফা কর্মসূচি নিয়ে আমার যে একটা কর্মসূচি আছে তা যে রাজীবজি ভোলেননি, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। তাই বছরশেষের দিকে একদিন যখন ওয়ান টু ওয়ান অ্যাপয়েন্টমেন্টে রাজীবজিকে একটু চাপহীন বলে মনে হল, প্রসঙ্গটা তুললাম।

তিনি বললেন, তোমার নোটটা পড়ার অবকাশ হয়নি, ঠিক কী চাইছ, একটু খুলে বলো। আমি সুযোগ পেয়ে বলতে লাগলাম যে, বিশদফা কর্মসূচির অন্তর্নিহিত বার্তা দল অনুধাবন করতে পারেনি বলে এর সুফলও দলের ঝুলিতে আনতে পারা যাচ্ছে না।

পশ্চিমবাংলা সমীক্ষা/নিরীক্ষণ কমিটির সদস্য হিসেবে আমার কয়েকটি জেলায় বিশদফার রূপায়ণ দেখবার সুযোগ হয়েছিল। তৃণমূল স্তরে, বিশেষ করে যেখানে কৃষিভিত্তিক কর্মসূচিগুলি রূপায়িত হচ্ছে, সেখানে তরুণ আধিকারিকদের পেয়েছি এবং কাউকে কাউকে দেখে বেশ কমিটেডও মনে হয়েছে। কিন্তু কোথাও দলের লোককে এ ব্যাপারে উদ্যোগী দেখতে পাইনি। আমি মনে করি, বিশদফার তাৎপর্য বুঝতে পারলে দলের কর্মীরা তার কী সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক প্রভাব পড়তে পারে তা বুঝতে পারত। ২০টির ভিতর ৯টি কর্মসূচি ছিল, গ্রামীণ ধনিক শ্রেণির কাছ থেকে আর্থিক ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে দরিদ্র শ্রেণির পায়ের নিচে শক্ত ভিত তৈরি করে দেওয়ার লক্ষ্যে রচিত। এত বড় একটা হাতিয়ার পাওয়া সত্ত্বেও যে শক্তি ইন্দিরাজিকে জরুরি অবস্থা জারি করতে বাধ্য করেছিল, যাদের চক্রান্তে তাঁর শস্য বিপণনের জাতীয়করণ ব্যর্থ হয়ে যায় এবং ইন্দিরাজির গরিবের স্বার্থে আর্থ-সামাজিক লড়াই মাঝপথে থমকে দাঁড়ায়— তাদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারলাম না। একবার হেরে গিয়েছি, তাই ৩০ মাস ক্ষমতার বাইরে থাকতে হয়েছে। এবার হারলে চলবে না। তাই এখন থেকেই দলের যুবশক্তিকে সেনার মানসিকতা নিয়ে এ লড়াইয়ে নামাতে হবে। খুব মন দিয়ে রাজীবজি শুনলেন। তারপর শুধু বললেন, 'ডান। তবে একটা শর্ত আছে। অর্থ যা লাগবে, আমি দেব। কিন্তু এই ভাবনাকে মাঠে নামাতে কোনও লোকবল পাবে না। সব তোমাকেই গুছিয়ে তুলতে হবে। এবং পেশাদার মানসিকতায় কাজটা হাতে নিতে হবে।' আমিও সেই কথাটাই বলতে চেয়েছিলাম— এক, কোনও প্রচার হবে না। দুই, যারা প্রশিক্ষিত হবে, তারা নিজের রাজ্য ছেড়ে বাইরের রাজ্যে গিয়ে কাজ করবে, যাতে স্থানীয় রাজনীতি তাদের প্রভাবিত করতে না পারে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে তো বেরিয়ে এলাম, কিন্তু কীভাবে করব? কাকে নিয়ে করব? কে ট্রেনিং দেবে? কোনও ব্যাপারেই তো কিছু ভেবে ওঁর কাছে যাইনি। এবার কার কাছে যাব?

প্রণবদা যখন অর্থ মন্ত্রী, তখন প্ল্যানিং কমিশনের একজন সদস্য মহঃ ফজল (উনি পরে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপালও হয়েছিলেন) ওঁর বাড়িতে প্রায়ই আসতেন এবং দাদার সঙ্গে দেখা করার জন্য বসতেই হত, আমার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিতেন। আমার হঠাৎ মনে হল, ফজল সাহেব এ ব্যাপারে আমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারবেন। দৌড়ালাম যোজনা ভবনে। ফজল সাহেব মন দিয়ে শুনলেন, তারপর কাউকে ফোন করলেন। আমাকে বললেন, 'তুমি কাল সকাল ১১টায় এসো। আমি একজনকে ডেকেছি। তিনি এ কাজটা খুব ভালভাবে করতে পারবেন। ওঁর এটাতেই স্পেশালাইজেশন।'

পরের দিন সকালবেলা ফজল সাহেবের চেম্বারে গিয়ে দেখি, একজন ম্যাডাম বসে আছেন। পরিচয় হল। ডঃ মালতী বোলার। ম্যানেজমেন্ট সায়েন্টিস্ট। উনি আমার কাছ থেকে আমার নোটটা নিলেন এবং বললেন, 'এক সপ্তাহ পরে আমরা এখানে আবার বসব।' সাত দিনের মাথায় যখন আবার বসলাম, ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, একতাল মাটি নিয়ে গিয়েছিলেন, প্রতিমা বানিয়ে নিয়ে এলেন। অসম্ভব পেশাদারিত্বের সঙ্গে বানানো একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। এবং প্রশিক্ষণ-উত্তর কর্মপ্রণালী (action plan)। আমার মনে হল, অন্ধকারে কেউ আলো নিয়ে এসে দাঁড়াল এবং শুধু পথটা নয়, পথের শেষে মন্দিরটাও দেখতে পাচ্ছি।

পুরো পরিকল্পনাটা লিখে অযথা পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। তবে সংক্ষেপে বলি, একটা প্রশিক্ষণের ভিতর যে এত বিষয় লুকিয়ে থাকে, আমি যখন

প্রোগ্রামটা নিয়ে লিখছি, নিজেও তখন জানতাম না, কোনও ধারণাও ছিল না। ম্যাডাম বোলার বুঝিয়ে দিলেন। এটা আসলে একটা ড্রিফ্রিজিং প্রসেস। একটা পরিচয় নিয়ে আসবে, আর-একটা পরিচয় নিয়ে ফিরে যাবে, এবং ফিরে গিয়ে যাতে পুরনো পরিবেশে কোনও 'ফেড আউট' এফেক্ট না আসে, তার জন্য তার এলাকা বদল জরুরি, এবং গভীরভাবে কর্মসূচিটাকে তার মনের ভিতরে গেঁথে দিতে হবে।

যদিও মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশদফা নিয়ে প্রশিক্ষিত করা, কিন্তু ৪৫ দিনের শিবিরে মূলত ৫টি বিষয়ের উপর পুরো পঠনপাঠন গড়ে তোলা হত। (১) কর্মসূচি ও দায়িত্ব সম্পর্কের ধারণা, (২) সেই দায়িত্বপালনের জন্য কী নতুন পরিচয় (সে কোনও গোষ্ঠীর নয়, সে দলের সৈনিক), (৩) প্রাসঙ্গিক জ্ঞান, (৪) অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগের দক্ষতা, (৫) দায়িত্বপালনের জন্য গভীর নিষ্ঠা ও একাগ্রতা।

প্রথম শিবির রাজীবজির সম্মতি নিয়ে শুরু হয়েছিল ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩-তে তালকাটোরা স্টেডিয়ামে। কোন প্রশিক্ষক কোন বিষয়ের উপর কী বলবেন, ম্যাডামই ঠিক করে দিতেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাকেন্দ্র ও গবেষণাধর্মী সংস্থার থেকে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে যেমন একদিকে একটা পেশাদারি আঙ্গিক ছিল, তেমনই দলের তাবড় তাবড় নেতাকে দিয়ে রাজনৈতিক বিষয় পড়ানো হত। পশ্চিমবাংলা থেকে একমাত্র সৌগতদা (রায়)-কে 'বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও তাদের নীতি ও আদর্শ' নিয়ে পড়াতে বলা হয়েছিল।

একটা ছিল শিক্ষণের দিক, আর-একটি ছিল শৃঙ্খলার দিক। আমি গোটা ব্যবস্থাটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলাম। তাই ঠিক করেছিলাম, ছেলেদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওদের উদ্‌বুদ্ধ করতে হবে। না হলে রাজীবজির কাছে ছোট হয়ে যাব।

প্রথম শিবির ছিল উত্তর ভারতের। ১২০ জন প্রশিক্ষণার্থী। ফেব্রুয়ারিতেও দিল্লিতে ঠান্ডা থাকে। তাই তালকাটোরা স্টেডিয়ামের বেসমেন্টে ছেলেরা ভালই ছিল। আমি থাকলাম বাইরের তাঁবুতে। সকাল ৫.৩০টায় উঠতে হত। ৬.৩০টা থেকে ৭.৩০টা শারীরিক শিক্ষা, পিটি, জগিং, কবাডি ইত্যাদি। রোজ জাতীয় পতাকা তোলা হত। প্রতিদিন কোনও না কোনও দলের প্রবীণ নেতা পতাকা তুলতে আসতেন। তাঁর সামনে জাতীয় সংগীত গাওয়া হত এবং তিনি কিছু না কিছু বলতেন। ৮.৩০টায় প্রাতরাশ। ১০টায় ক্লাস শুরু। ১টায় লাঞ্চ। ২টোয় আবার ক্লাস, ৫টা পর্যন্ত। ৫.৩০টা থেকে ৬.৩০টা খেলা (ভলিবল, ফুটবল), ৭.৩০টা থেকে ৮.৩০টা দেশাত্মবোধক চলচ্চিত্র

প্রশিক্ষণ শিবিরে রাজীবজিকে পতাকা তুলতে সাহায্য করছেন দেবপ্রসাদ রায়

প্রদর্শনী। ৯টায় ডিনার। ১০.৩০টায় নিষ্প্রদীপ। কোনও ছুটি নেই। বাড়ি যেতে হলে নাম কাটিয়ে চলে যাও। আর আসতে হবে না। এমনভাবে রাখা হত যে, বাড়ির কথা ভাববার কোনও সুযোগ দেওয়া হত না।

প্রথম সাত দিন পর দেখলাম, ছেলেরা সকালে পিটি-র পর আমাকে প্রণাম করে যে যার ঘরে যাচ্ছে। আমি হাঁ হাঁ করে উঠতাম— এটা কী হচ্ছে! ওরা বলত, রাজনীতিতে এতদিনে একজন সত্যিকারের বড় ভাইকে পেয়েছি, এটুকু সম্মান ফিরিয়ে দেবেন না? আমি অচিরেই সকলের 'দাদা' হয়ে গেলাম। ম্যাডাম ক্লাস দেখতেন, আমি ক্লাসও দেখতাম, শৃঙ্খলাটাও দেখতাম। আর নিজেও শৃঙ্খলা ওদের মতোই পালন করতাম। ক্যাম্প থেকে কোথাও যেতাম না। দেড় মাসের ট্রেনিং। সবই রাখতে হত। লাইব্রেরি, ডাক্তার, ধোবি— আর সব দিকে নজর রাখতে হত।

একদিন সকালবেলা পতাকা তুলতে রাজীবজি এলেন। পুরো সময়টা পিটি, প্যারেড, ড্রিল— সব দেখে ছেলেদের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করে তারপর গেলেন। বুঝলাম, ওঁর মনে দাগ ফেলতে পেরেছি। কারণ, একশো কুড়িজন ছেলেকে দাঁড় করিয়ে ওদের নাম ও জেলার নাম যখন বলতে লাগলাম এক-এক করে পরিচয় করাতে গিয়ে, ওঁর চোখে-মুখে একটা বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠেছিল। আমার একবারও কারও নাম নিতে কখনও ভুল হয়নি। কারণ কাজটা খুব একাগ্রতার সঙ্গে নিয়েছিলাম। নেব না-ই বা কেন! এই প্রথম কংগ্রেস দলে আমার যে কিছু করবার যোগ্যতা আছে তা প্রমাণ করবার সুযোগ উনিই তো প্রথম দিলেন। তার আগে তো রাজ্যে 'মিঠু' প্রিয়'র লোক না সোমেনের লোক বা তারপরে, বরকতের না প্রণবদার— এই বিতর্কেই সময় কেটে গেল।

ছয় সপ্তাহের প্যাকেজে এক সপ্তাহ ফিল্ড ভিজিটের জন্য ছিল। আমরা এই এক সপ্তাহ হরিয়ানার হিসারে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতাম। ওদের একটা ফার্মারস' ট্রেনিং হস্টেল ছিল। সেখানে থাকতাম, আর ছেলেদের পোলট্রি, গোটারি, ডেয়ারি কালচারের শর্ট কোর্স করিয়ে শংসাপত্র দেওয়া হত।

এটা হত চতুর্থ সপ্তাহে। এর ভিতরই ছেলেদের ভিতর একটা অস্থিরতা শুরু হয়ে যেত। কবে কাজে নামব, কবে প্রমাণ করব যে, যার জন্য এনেছ, তার উপযুক্ত আমি হয়ে উঠেছি।

বস্তুত, রাজ্য নেতৃত্বগুলিকে যখন বলা হয়েছিল যে, জেলাপ্রতি একজন করে যুবকর্মী পাঠান, যে দশ মাস রাজ্যের বাইরে থেকে কাজ করবে এবং ৫০০ টাকা করে সাম্মানিক পাবে। তার ভিতর তাকে নিজের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। সবাই মোটামুটি এটা ভেবেই পাঠিয়েছিল, যে ছেলেগুলোকে দিয়ে এখানে কিছু হবে না, ওদেরই পাঠিয়ে দিই। অন্তত আমার ঘাড় থেকে নামবে, আর মাস গেলে ৫০০ টাকা করে তো পাবে!

আমার কাছ থেকে একতাল মাটি নিয়ে গিয়ে ম্যাডাম একটা প্রতিমা বানিয়ে যদি নিয়ে এসে থাকেন তো, আমি রাজ্যগুলি থেকে 'অকম্মা'দের নিয়ে দলের নিষ্ঠাবান সৈনিক করে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে, বাড়িঘর ছাড়িয়ে, বিদেশ-বিভুঁইয়ে এদের পাঠিয়ে এরা যে অকম্মা নয় তা প্রমাণ করতে পেরেছিলাম।

এই কর্মযজ্ঞ চলেছিল ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত। অনেক অভিজ্ঞতা, অনেক কাহিনি— তবে আজ সারা দেশের প্রায় সব জেলাতেই যে আমার দু'টি-একটি সাথি এখনও খুঁজলে পাওয়া যায়, তার একমাত্র কারণ এই কর্মসূচি।

পরবর্তীতে রাজীবজির কৃপায় এআইসিসি-র সচিব স্তরে উত্তরণ, রাজ্যসভার সদস্যপদ ও সর্বভারতীয় রাজনীতিতে গুরুত্ব যেমন এই কর্মসূচিকে ঘিরেই, তেমনই দিল্লি থেকে 'মোহভঙ্গ' হয়ে ফিরে আসাও এই কর্মসূচির কারণেই। সে আর-এক কাহিনি।

(ক্রমশ)

কবে জাগবে আবার ঘুমিয়ে থাকা দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ?

দিন কয়েক আগের এক সান্ধ্য আড্ডায় কাউকে একটা মন্তব্য করতে শুনেছিলাম। এ রাজ্যের ইকো পর্যটন প্রসারে এক আলিপুরদুয়ার জেলায় যে অমূল্য রতন আছে আর কোনও জেলাতেই বোধহয় নেই! পাল্টা মন্তব্যও ছিল জোরদার, মানুষ যদি জানতেই না পারল তবে সেসব সম্পদ থেকেই বা কী লাভ! সে দিনকার তক্কো গড়িয়েছিল অনেকটা, যার মর্ম অল্প অল্প করে বুঝতে শুরু করেছিলাম এবারের এই উইকএন্ড টুরে এসে।

গাড়িটা ফালাকাটার মাদারি রোড থেকে ডান দিকে বাঁক নিতেই যেন পটপরিবর্তন চালু হয়ে গেল। আরও কিছুটা এগিয়ে যেতে জনবসতিও কমতে শুরু করল। যত দূর চোখ যায়, গাছের সারি। তার মধ্যে দিয়ে একটা সরু রাস্তা নেমে গিয়েছে। ওটাই আমাদের পৌঁছে দেবে দক্ষিণ খয়েরবাড়িতে। প্রথমে আমাদের অন্য জায়গায় রাত্রিবাসের কথা ছিল। তাতে কিছু সমস্যা হওয়ায় আমার বন্ধু অভিজিতের জোরাজুরিতে শেষমেশ খয়েরবাড়িই ঠিক হল! ও আবার, বন দপ্তরেই আছে কিনা অগত্যা গন্তব্য সাউথ খয়েরবাড়ি। শেষের ওইটুকু পথ যেন শেষই হচ্ছিল না। গাড়ি এসে যেখানে থামল, সেখানে বেশ কয়েকটি অস্থায়ী চায়ের দোকান। এমনিতেই মনটা চা চা করছিল। তাই আর দেরি না করে চায়ের অর্ডার দিয়ে গল্প জুড়লাম। এখানে যারা দোকান করে, সকলেই পিছনের গ্রামের লোক। ওদের মুখেই শুনলাম, প্রায় দিনই হাতি চলে আসে এদিকে। তারপর পটকা ফাটিয়ে তাদের আবার

ফেরত পাঠানো হয়। দিদি-জামাইবাবু এসব শুনে তো মহা উত্তেজিত। খড়্গপুর থেকে তারা এসেছে কোচবিহার সংলগ্ন ডুয়ার্স ঘুরতে। চা-পর্ব মিটিয়ে আবার গাড়ি। আমরা ঢুকব দক্ষিণ খয়েরবাড়ির ভিতরে। যেহেতু আমাদের ওখানকার কটেজে বুকিং ছিল, তাই আর টিকিট কাটার দরকার পড়ল না। বনরক্ষী গেট খুলে দিল, আমরা ঢুকে গেলাম সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে। একটা লম্বা কাঠের ব্রিজ পার হয়ে ডান দিকে বিশাল ওয়াচটাওয়ার। বাঁ দিকে চোখ পড়তেই মন একটা অদ্ভুত আনন্দে ভরে গেল। যত দূর চোখ যায়, ঘন সবুজ জঙ্গল। সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে পাহাড়ি নদী 'মরা তোর্সা'। পাশে ছোট ছোট টিলার উপরে ছবির মতো কটেজ। প্রতিটি কটেজ থেকে সিমেন্টের সিঁড়ি নেমে গিয়ে নদীতে মিশেছে। এক কথায় ছবির মতো দৃশ্য।

বুকিং অনুযায়ী লাগেজ রেখে সিঁড়ি দিয়ে সোজা নদীর কাছে। বাঁধানো সিঁড়িতে পা ডুবিয়ে দিতেই জলের ঠান্ডা স্পর্শ শরীর ও মনে আরাম এনে দিল। নদীটি এখানে

হাতি সাফারি চলছে

অগভীর। নদীতে বালি-পাথরের উপরে প্রচুর পরিমাণে নানা ধরনের শেওলা রয়েছে। শান্ত পরিবেশ, সবুজের মাঝে জলে পা ডুবিয়ে নদীর কুলকুল শব্দ শুনতে শুনতে আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। ঘোর ভাঙল ছেলের ডাকে। সবাই একটু আশপাশটা ঘুরতে চায়। সবাই মিলে চললাম কটেজের নীচ দিয়ে। ওখানে মোট তিনটে ডাবল বেডের কটেজ আছে।

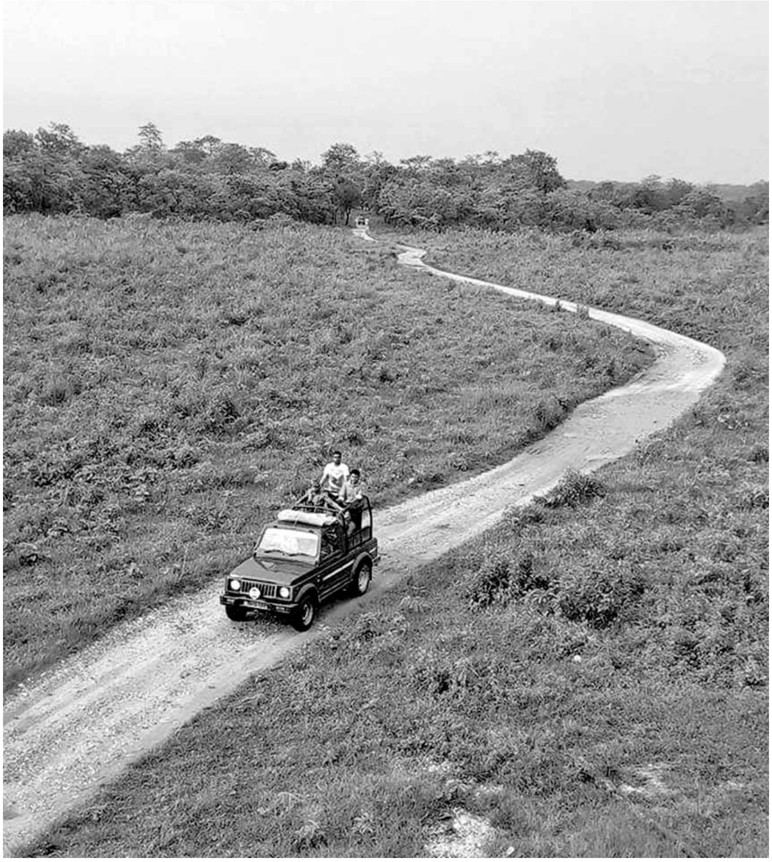

কটেজের ভাড়া ১৪২২ টাকা। আর রয়েছে একটা ডরমিটারি। সেখানে দু'ভাগে ৫, ৫— মোট ১০টি বেড। এক-একটা দিকের ভাড়া ৭৫০ টাকা। ডরমিটারিটাও বেশ সুন্দর। সে দিন আমরা ছাড়া আর কোনও কটেজেই লোক ছিল না। রোদটা বেশ চড়া হওয়াতে বেশি ঘোরাঘুরি করা গেল না। কটেজে ঢুকে জামাকাপড় বদলে নিতে নিতেই দুপুরের খাবারের ডাক পড়ে গেল।

আমাদের দুটো কটেজের মাঝামাঝি পিছন দিকে খাবার ঘর বা ডাইনিং। সামনের দিকটা গ্রিল দিয়ে ঘেরা, চেয়ার-টেবিল পাতা। রান্নাঘরের ভিতর থেকে থালা সাজিয়ে এনে আমাদের দেওয়া হল। গরম ধোঁয়া-ওঠা ভাত, ডাল, আলু ভাজা, আলু-পটোলের তরকারি আর দেশি মুরগির মাংসের ঝোল। সঙ্গে উপরি পাওনা হিসেবে পেঁয়াজ, লেবু আর লংকা। যত্ন করে খাওয়াল ওরা। বেশ উপাদেয় রান্না আর সুস্বাদু। বাচ্চারাও দেখলাম খুব তৃপ্তি করে খেল। সেখানেই পরিচয় হল পার্থবাবুর সঙ্গে। ভালনাম পার্থসারথি সিনহা। তবে পার্থ 'টাইগার' বলেই বেশি পরিচিত। সাউথ খয়েরবাড়ি হল 'লেপার্ড টাইগার রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার'। ওখানে যেসব বাঘ থাকে, উনি তাদের দেখাশোনা করেন। প্রথম জীবনে ১২ বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে

পরিচয় হল পার্থবাবুর সঙ্গে। ভালনাম পার্থসারথি সিনহা। তবে পার্থ 'টাইগার' বলেই বেশি পরিচিত। সাউথ খয়েরবাড়ি হল 'লেপার্ড টাইগার রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার'। ওখানে যেসব বাঘ থাকে, উনি তাদের দেখাশোনা করেন। প্রথম জীবনে ১২ বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে সার্কাসে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানেও বাঘেদের সঙ্গেই তাঁর ওঠাবসা ছিল।

সার্কাসে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানেও বাঘেদের সঙ্গেই তাঁর ওঠাবসা ছিল। পরবর্তীতে সার্কাস থেকে বাঘেদের নিয়ে চলে আসায় পার্থবাবুকে বন দপ্তরে তাদের দেখাশোনা করার জন্য ক্যাজুয়াল স্টাফ হিসেবে নিয়োগ করা হয়। বর্তমানে অবশ্য উনি বন দপ্তরের স্থায়ী কর্মী। এইসব বাঘকে নিয়ে নানা অভিজ্ঞতায় তাঁর ঝুলি ভরা। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এ কাজ তিনি করেন। পরম মমতায় দেখাশোনা করেন বাঘেদের। ভালওবাসেন নিজের সন্তানের মতো। এ কাজে তাঁর কোনও ছুটি নেই। কলকাতার পাইকপাড়ার বাসিন্দা নিজেকে এখানকারই একজন করে নিয়েছেন। বিয়েও করেছেন ডুয়ার্সের স্থানীয় মেয়েকে। পার্থবাবুর মুখেই শুনলাম এখানকার বাঘেদের বিচিত্র সব ঘটনার কথা। বাঘের গল্প শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমার ছেলে আর দিদির মেয়ে বায়না ধরল বাঘ দেখার। পার্থবাবু বললেন, এই রোদে বাঘ খাঁচা ছেড়ে বার হবে না। রোদ একটু পড়লে তখন তারা খাঁচার বাইরে আসবে। অগত্যা নদীর সামনে একটু ঘোরাফেরা করে কটেজে ফিরে এলাম।

ঘরগুলো এয়ারকন্ডিশনড না হলেও ফুরফুরে হাওয়ায় তেমন গরম বোধ হচ্ছিল না। বিছানাতে গা এলিয়ে দিতেই দরজা দিয়ে চোখ চলে গেল সামনে বয়ে চলা নদী আর তারপরেই জঙ্গলের দিকে— সে এক অনন্য অনুভূতি। একটু পরেই রোদ কমে এল। আর আমরাও চললাম লেপার্ড আর টাইগার দেখতে।

বিরাট বিরাট জঙ্গল ঘিরে তৈরি করা হয়েছে বাঘের খাঁচা। তার মধ্যে আবার বাঘেদের থাকার জন্য পাকা ঘর। এখানে ৯টি লেপার্ড আছে। একটি মাত্র টাইগার। এদের দেখার জন্য প্রতিদিনই দূরদূরান্ত থেকে পর্যটকরা আসেন। সে দিনও তাঁদের ঢল ছিল। নীরবতা প্রার্থনীয়— সতর্কবাণীকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তাঁদের লেপার্ড দেখার উল্লাস সমস্ত নিস্তব্ধতাকে খানখান করে দিচ্ছিল। আমাদের কোনও তাড়া ছিল না। ধীরেসুস্থে ঘুরে দেখছিলাম চারদিক। গরমে (নাকি বয়সের ভারে?) বেশির ভাগ লেপার্ডই ক্লান্ত। ফেরার পথে খুব কাছ থেকে, মাত্র এক হাত দূরত্বে একটা লেপার্ড দেখার সুযোগ হল। আমাদের দেখেই খাঁচার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল সে। মাত্র একবারই আমাদের দিকে সরাসরি তাকিয়েছিল। তারপর আমাদের আর পাত্তা দেবার প্রয়োজন মনে হয়নি তার। যতক্ষণ ওখানে ছিলাম, সে বীরদর্পে হাঁটাহাঁটি করল, আর তাকালই না। বেশ কয়েকটা ছবি তুলে আবার ফেরার পথ ধরলাম।

একসময়ে এখানে লেপার্ড সাফারি ছিল। ২০০৩ সালে এশিয়ার মধ্যে প্রথম এখানেই লেপার্ড সাফারি শুরু হয়েছিল। ২০১০ সালে তা বন্ধ হয়ে যায়। শুনলাম, আবার নাকি তা শুরু করার কথা ভাবা হচ্ছে। এখানে একটা আয়ুর্বেদিক প্ল্যান্টেশন ইউনিট আছে। ৫ হেক্টর জমিতে রয়েছে হরীতকী, বহেড়া, নাগেশ্বর, রিঠা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের

আয়ুর্বেদিক গাছ। এই জঙ্গলের বেশির ভাগই সেগুন গাছ। দেখলাম, সূর্য পাটে যাবার আগে গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। নিস্তব্ধ পরিবেশে এখন শুধু বিভিন্ন ধরনের পাখির ডাক শোনা যাচ্ছিল। কটেজের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে নদীর জলের স্রোতটা একটু বেশিই মনে হল। উত্তরে মেঘ করেছে। বুঝলাম, পাহাড়ে বৃষ্টি হওয়ায় নদীর জল হঠাৎই বেড়ে গিয়েছে। ওয়াচটাওয়ারে উঠে চারদিকটা দেখা যাচ্ছিল। যত দূর চোখ যায়, শুধুই সবুজ। সেখান থেকে নেমে কাঠের ব্রিজটা হেঁটে পার হতে গিয়ে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হল। আসার পথে গাড়িতে ছিলাম, সে জন্য বুঝিনি যে তার এমন কঠিন দশা। কাঠগুলো বেশির ভাগই খুলে আসছে। হাঁটতে গেলেই সেগুলো দোলে। অনেকগুলো কাঠের পাটাতন ভেঙে গর্ত হয়ে আছে। এখান দিয়েই প্রতিদিন শয়ে শয়ে পর্যটক তো বটেই, গ্রামের লোকজন, গাড়ি, বাইক— সব চলাচল করে প্রাণ হাতে নিয়ে। মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। আশা করি খুব শিগগিরি সংশ্লিষ্ট দপ্তর এটি মেরামতের উদ্যোগ নেবে। সামনেই দু'খানা চিলড্রেন'স পার্ক। খুব মেনটেনড না হলেও দোলনা, স্লিপার, সি-স দিয়ে সাজানো। সেখানে একটু সময় কাটাতেই জঙ্গলের নিয়ম মেনে ঝুপ করে সন্ধে নেমে গেল। সকালেই হাতির গল্প শুনেছিলাম। একটা দল ক'দিন ধরেই নাকি ঘোরাফেরা করছে এদিকে। তাই আর ঝুঁকি নিলাম না। আবার সন্তর্পণে সেতু পেরিয়ে ফিরে এলাম কটেজের কাছে।

এখানে যারা রাত্রিবাস করবে, তাদের খাবারের দায়িত্ব দেওয়া রয়েছে বনসুরক্ষা কমিটির উপর। সন্ধে হতে তারাই চা নিয়ে এসে দিল। আমরা বারান্দায় কেউ চেয়ারে, কেউ সিঁড়িতে বসে চাঁদের আলোয় তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছি সেই পরিবেশকে। একটু পরে এল চিকেন পকোড়া। সামনে জলের স্রোতের কুলকুল শব্দ, ঝিঁঝিপোকার ডাক, জোনাকির জ্বলা-নেবা, সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা আর গান। জীবনের সব জটিলতা এই পরিবেশের সামনে তুচ্ছ। মাঝে মাঝেই মেঘে আর চাঁদে চলছিল লুকোচুরি খেলা। হঠাৎই নদীতে আলো চোখে পড়ল। ছোট ছোট আলো দূর থেকে নদী বরাবর আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এমন নির্জন পরিবেশে এ ধরনের আলো আমাদের মধ্যে বেশ একটা রোমাঞ্চকর কৌতূহলের সৃষ্টি করল। একটু পরেই বুঝলাম, এরা নদীতে মাছ ধরছে। এই নদীতে প্রচুর বোরোলিজাতীয় নদীয়ালি মাছ পাওয়া যায়।

এমন সময় খুব কাছে একটা পটকার আওয়াজে আমরা নড়েচড়ে বসলাম। পরপর আরও দুটো আওয়াজ। রান্না যারা করছিল, তারা বলল, ওই আবার আজকে হাতি এসেছে। এর পর শুরু হল টিন পেটানোর আওয়াজ। গ্রামের খেতে ভুট্টা পেকেছে। হাতিগুলো সেই ভুট্টার লোভে প্রায় দিনই এদিকটায় চলে আসছে। আমাদের খুব ইচ্ছে করছিল একবার ওখানে যেতে, যদি হাতির পাল দেখা যায়। সে উৎসাহে জল ঢেলে দিল ওরা। রীতিমতো শাসনের সুরে বলল, এই অন্ধকারে ওদিকে যাবার চেষ্টাই করবেন না। অগত্যা ওদের কথাই মুখ বুজে মেনে নিলাম। রাতের অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে হাতির পাল দেখা আমাদের এ যাত্রায় হল না। রাতের খাবারের ডাক এল। রুটি আর ডিমের

পার্থ 'টাইগার'

অমলেটের কারি করতে বলা হয়েছিল। ভোজন পর্ব শেষ করে আবার এক প্রস্থ আড্ডা। পরদিন আমাদের ভোরবেলার সাফারিতে যাবার কথা।

এখানে চুপিচুপি জানিয়ে রাখা ভাল, যারা দক্ষিণ খয়েরবাড়িতে থাকবে, তাদের জন্য হাতি সাফারির সুযোগ আছে। মাদারিহাটে যখন হাতিতে চড়ার চাপ থাকে তখন খয়েরবাড়ির বুকিং নিলে হাতি সাফারির সুযোগ থাকে। এখানের জন্য একটি হাতিই বরাদ্দ। অর্থাৎ চারজন তাতে যেতে পারবে। আমাদের ছ'জনের গ্রুপের জন্য আমরা জিপসি সাফারি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এবার ঘুমের পালা। যদিও প্রকৃতির ওই মোহ ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না তা-ও উঠতে হল। পোকা আর পিঁপড়ের উৎপাতে মশারি টাঙাতে হল। মাঝরাত থেকে শুরু হল বৃষ্টি। টিনের চালে সেই বৃষ্টির আওয়াজ ছোটবেলার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

জলদাপাড়াতে আমাদের রিপোর্টিং টাইম ছিল ভোর ৫টা। ঘুম ভাঙল অ্যালার্মের শব্দে। তখন চারটে বাজে। ফ্রেশ হয়ে বাইরে এসে দেখি, আলো ফুটছে। সারারাতের

এমন সময় খুব কাছে একটা পটকার আওয়াজে আমরা নড়েচড়ে বসলাম। পরপর আরও দুটো আওয়াজ। রান্না যারা করছিল, তারা বলল, ওই আবার আজকে হাতি এসেছে। এর পর শুরু হল টিন পেটানোর আওয়াজ। গ্রামের খেতে ভুট্টা পেকেছে। হাতিগুলো সেই ভুট্টার লোভে প্রায় দিনই এদিকটায় চলে আসছে।

বৃষ্টির পর গাছের পাতাগুলো যেন আরও সবুজ হয়ে উঠছে। বুক ভরে জঙ্গলের শুদ্ধ বাতাস নিলাম। নদীতে জল বেড়েছে। পাখিদের বিভিন্ন আওয়াজে জঙ্গল মুখরিত। এই অঞ্চলে হর্নবিল থেকে শুরু করে বালিহাঁস, শামুকখোলসহ নানান ধরনের পাখি দেখতে পাওয়া যায়। নাম-না-জানা বেশ কিছু পাখি আমাদের চোখে পড়ল। সময় হয়ে যাচ্ছে, তাই দেরি না করে জলদাপাড়ার উদ্দেশে গাড়ি ছুটল। ওখানে পৌঁছাতে ৩০ মিনিট মতো সময় লাগল। জলদাপাড়া বিট অফিসের সামনে যখন গাড়ি থামল, দেখি আমাদের সাফারির কাগজ নিয়ে পার্থবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। নির্দিষ্ট জিপসিতে উঠে পড়া গেল। জলদাপাড়া টুরিস্ট লজের সামনে দিয়ে জিপসি ছুটল জলদাপাড়া ন্যাশনাল পার্কের উদ্দেশে। সঙ্গের গাইড সতর্ক দৃষ্টি রাখছিল জঙ্গলের মধ্যে। দুটো ওয়াচটাওয়ার, হলং বাংলো— সব ঘুরে আমরা বেশ কিছু ময়ূর, বাইসনের দল, বার্কিং ডিয়ার, হরিণ, একটা গন্ডার আর কয়েকটা কুনকি হাতির দেখা পেলাম। সাফারির শেষে জলদাপাড়ায় চা-বিস্কুট খেয়ে আবার কটেজে ফেরার পালা।

সওয়া ন'টার দিকে ফিরে শুরু হল গোছগাছ। বাথরুম বেশ পরিষ্কার। স্নান করে রেডি হয়ে গেলাম। ব্রেকফাস্টের ডাক এল। লুচি, তরকারি, মিষ্টি আর চা খেয়ে ওদের টাকাপয়সা মিটিয়ে দিলাম। এত সুন্দর জায়গা ছেড়ে চলে আসতে মন এক্কেবারেই সায় দিচ্ছিল না। পর্যটক টানার মতো সব কিছু এখানে থাকা সত্ত্বেও জায়গাটির তেমন কোনও প্রচার নেই। ফলে কটেজগুলো প্রায় সময়ই ফাঁকা থাকে। দিনে যেসব পর্যটক

বাকি অংশ ২৭ পাতায়

গ্রীষ্মের প্রকোপ থেকে ফলই সুস্থ রাখতে পারে শরীর

বাড়তি ছেলেমেয়ের এখন গরমের ছুটির সময়। ডুয়ার্সে কালবৈশাখির মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে। জ্যৈষ্ঠের প্যাচপেচে গরম থেকে মুক্তি মেলা এরপর ভার মাস দুয়েক। অনেকেই বলেন, দুপুরের রোদ আগে এত অসহ্য ছিল না, এখন যেন চামড়া ভেদ করে শরীরের ভেতর ঢুকে যায়। স্কুলে ছুটি থাকলে কী হবে, গরমের ছুটি মানে ঘরের এসি চালিয়ে লেখাপড়া করে দিন কাটালেও রক্ষে নেই। এসি বা ননএসি যাই থাকুক, গরমে শরীরে জলীয় অংশের ঘাটতি পড়বেই, তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় মিনারেল। সর্দিগর্মির মতো রোগ তো আছেই, এসময় শরীরে প্রয়োজনীয় জল ও মিনারেলের ঘাটতি পূরণ না করলে শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যেসব ক্ষতিসাধন হবে তা এই কচি বয়সে তেমন মানুষ না হলেও ভবিষ্যতে তা যে যথেষ্ট ভোগাবে তা বলাই বাহুল্য। অথচ কেই বা চাইবে জেনেবুঝে নিজেদের ভবিষ্যত

'ডুয়ার্সের ডিশ'। এবার থেকে ডুয়ার্সের রাঁধুনিরা হাজির করছেন রন্ধনশৈলীর নানা এক্সপেরিমেন্ট। সূচনা করলেন **শ্রাবণী চক্রবর্তী**, যাঁর হাতের রান্নায় মমত্ব ও জাদু দুই-ই আছে। আপনিও আপনার উদ্ভাবনী রন্ধনশৈলীর পরিচয় দিতে পারেন আকর্ষণীয় কোনও রেসিপি পাঠিয়ে। মেল করুন 'এখন ডুয়ার্স'-এর ই-মেল আইডি-তে।

ছোলার ডাল দিয়ে এঁচোড়

উপকরণ: ছোলার ডাল ২০০ গ্রাম, চারকোনা করে কাটা এঁচোড় ২৫০ গ্রাম, বড় পেঁয়াজ কুচি ২টো, গ্রেট করা আদা ১ ইঞ্চি, টম্যাটো কুচি (বিচি ছাড়া) ২টো, কাঁচালংকা স্বাদ অনুসারে, শুকনো লংকা, গোটা গরম মশলা ও তেজপাতা কয়েকটি, গরম মশলা গুঁড়ো ১ চা-চামচ, ঘি ২ চা-চামচ, নুন ও চিনি স্বাদ অনুসারে, সাদা তেল ৪ চা-চামচ, গোটা জিরে আধ চা-চামচ, জিরে গুঁড়ো ১ চামচ, লংকা গুঁড়ো স্বাদ অনুসারে।

প্রণালী: এঁচোড়গুলো প্রেশার কুকারে একটা সিটি দিয়ে নামিয়ে জল ঝরিয়ে নিতে হবে। ছোলার ডাল আধ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে প্রেশার কুকারে ২টো সিটি দিয়ে কিছুক্ষণ মুখটা বন্ধ রেখে ঢাকনাটি খুলে নিতে হবে। এবার কড়াইতে তেল দিয়ে গ্যাসে বসিয়ে দিতে হবে। তেল গরম হলে একে একে শুকনো লংকা, জিরে, তেজপাতা, গোটা গরম মশলা, গ্রেট করা আদা ও পেঁয়াজ কুচি দিয়ে খুব ভাল করে ভাজা ভাজা করতে হবে। পেঁয়াজের রং একটু বাদামি হলে এঁচোড় কড়াইতে দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে হলুদ, জিরে, লংকা গুঁড়ো এবং টম্যাটো কুচি দিয়ে খুব ভালভাবে কষতে হবে। কাঁচালংকাগুলো একটু চিরে দিয়ে নুন ও চিনি দিন। খুব ভাল করে কষানো হয়ে গেলে সেদ্ধ করা ছোলার ডাল দিয়ে দিন ও কড়াই চাপা দিয়ে ঢেকে গ্যাসের আঁচ কমিয়ে রাখুন। ৮/১০ মিনিট এভাবে থাকবার পর ঢাকনাটি খুলে দেখুন, কেমন ডাল-এঁচোড় মিশে বেশ মাখো মাখো রান্নাটি হয়েছে। নামাবার আগে ঘি ও গরম মশলা দিয়ে আবার ঢেকে রাখুন ও গ্যাস বন্ধ করে দিন। লুচি, পরোটা, রুটি বা ফ্রায়েড রাইস, পোলাওয়ের সঙ্গে এই পদটি খেতে দারুণ লাগবে।

প্রজন্মকে বিপদের মুখে ফেলতে!

গরমের প্রকোপকে নিজেদের ও বাচ্চাদের বাঁচাতে কতগুলি টিপস দেওয়া হল, যার হয়ত বেশির ভাগটাই অজানা নয়, তবু একবার হাতের কাছে পেলে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যায়, এই যা।

যেমন স্কুল ছুটি থাকলেও বাচ্চাদের রুটিন যেন বিঘ্নিত না হয়। সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠা, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়াটা এসময় ভীষণ দরকার। সেই সঙ্গে বাঁচা থাকবে সকাল দুপুর রাতে খাবার সময়।

২) প্রবল গরমে বাচ্চাদের হাত থেকে চিপসের প্যাকেট, দোকানের বার্গার-রোল ইত্যাদি দূরে রাখুন। এসময় ডাল-ভাত-রুটি-স্যালাড দই এসবের মধ্যে খাওয়া দাওয়া সীমাবদ্ধ রাখুন।

৩) বাচ্চারা এমনিতেই দুধ খেতে চায় না, এসময় ওদেরকে লস্যি, আমপান্না, বাটার মিল্ক, বা মিল্ক শেক খাওয়ান। নিজেরাও চেখে দেখতে পারেন, একটু তো ব্রেক আসবেই। তবে কখনই বাইরের তৈরি এসব পানীয় নৈব নৈব চা, কারণ যে জলটা ব্যবহৃত হচ্ছে তা কতটা নিরাপদ কেউ বলতে পারবে না।

৪) শরীরে জলের পরিমাণ কতটা কমে গিয়েছে সাধারণত প্রস্রাবের রং দেখেই তা পরিস্কার বোঝা যায়। ঘন ঘন জল খাবেন ঠিকই কিন্তু খুব বেশি নয়, তেষ্টা পেলে তবেই খাবেন। বরং জলের বিকল্প হিসেবে এসময় খান গরমের সুস্বাদু সব ফল, যা একই সঙ্গে মহা উপকারী। যেমন—

শরীরে জলের পরিমাণ কতটা কমে গিয়েছে সাধারণত প্রস্রাবের রং দেখেই তা পরিস্কার বোঝা যায়। ঘন ঘন জল খাবেন ঠিকই কিন্তু খুব বেশি নয়, তেষ্টা পেলে তবেই খাবেন। বরং জলের বিকল্প হিসেবে এসময় খান গরমের সুস্বাদু সব ফল, যা একই সঙ্গে মহা উপকারী।

আম— ভিটামিন এ, সি, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস সব জুটবে আমেই। ফলে বাজে কোলস্টেরল কমে, ভাল থাকে হার্ট ও ব্লাড সুগার।

লিচু— প্রোটিন, ভিটামিন, ফ্যাট, সাইট্রিক অ্যাসিড, ফসফরাস ও লোহা থাকে এই ফলে। ক্যানসার, হাড় ক্ষয় ইত্যাদি রোগের প্রতিষেধক ক্ষমতা থাকে লিচুতেই।

পেপে— পেপের খাদ্য গুণের মধ্যে আজকের যুগে বেশি হিট যেটি সেটি হল পেপের অ্যান্টি অক্সিডেন্ট গুণ গালের চামড়া কুঁচকে যাওয়া থেকে রোধ করতে পারে। আবার বৃহদন্ত্রের নানা রোগ প্রতিরোধ করে পেপে থেকে পাওয়া পাপায়া নামক এনজাইম।

পেয়ারা— সোডিয়াম হীন লো ফ্যাট, লো ক্যালরির এই ফলে আছে ভিটামিন সি। গরমে যে সব রোগে ভোগে উত্তরবঙ্গের মানুষ অর্থাৎ সর্দিকাশি, ডাইরিয়া, আন্ত্রিক রোগ ইত্যাদির জন্য মোক্ষম প্রতিরোধক এই পেয়ারা। থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের অসুখের প্রতিরোধক হিসেবেও পেয়ারা বড় ভূমিকা নিতে পারে। রক্ত পরিষ্কার রাখা এবং ক্ষয়িষ্ণু নার্ভের রোগের জন্য পেয়ারা কার্যকর।

আনারস— প্রোটিন ও ফ্যাট খাদ্য হজম করতে সাহায্য করে। ঈষৎ গুরুপাকের শেষ পাতে দই বা আইসক্রিমের সঙ্গে কয়েকটুকরো আনারস সম্ভবত সেই জন্যই দেওয়া হয়।

ডাব— শরীরের জলীয় অংশের ভারসাম্য রক্ষায় কচি ডাব অতুলনীয়।

জাম— ফাইবার ও ভিটামিন ডি তে পরিপূর্ণ রসাল এই ফল গরমে যথেষ্ট উপযোগী।

কামরাঙা— বাংলার বিলুপ্তপ্রায় অন্যতম এই ফলে শরীরের ভিটামিন সি ও জলীয় অংশের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

কলা— শরীরে পটাশিয়ামের পরিমাণ রক্ষার জন্য অব্যর্থ, সেই সঙ্গে অ্যাসিডিটি দূর করে কোষ্ঠকাঠিন্যের মোকাবিলা করে কলা।

আমলকি— এই ফল গরমের ছুটিতে রোজ একটি ভাতের সঙ্গে সেদ্ধ খেতে বাধ্য করুন ছেলেমেয়েদের। পেটের রোগ নির্মূল হতে পারে, আপনার অজান্তেই।

গরমের এই দশটি ফল শরীরকে নানা রকম রোগের প্রতিরোধক করে তুলতে পারে। পুরোপুরি রক্ষা করতে পারে আগামী প্রজন্মের স্বাস্থ্য। কিন্তু একই সঙ্গে গরমে যেসব পানীয় বা খাবারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হবে তা হল—

১) রাস্তায় বিক্রীত যে কোনও পানীয় বা কাটা ফল।

২) নানা রকম স্পোর্টস ড্রিঙ্কস। শরীরে পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও ক্যালসিয়ামের যে কোনও সমস্যাই হঠাৎ করেই গুরুতর হয়ে উঠতে পারে। কাজেই খাওয়া হোক না হোক, গরমে ফলের সংস্পর্শে থাকলে সুস্থ থাকার গ্যারান্টি দেওয়া যায়।

মৃন্ময়ী মহাপাত্র

২৫ পাতার পরের অংশ

আসেন, তাঁরা ২০ টাকা প্রবেশমূল্য দিয়ে ঢুকে রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ঘুরে দেখেন। নদীতে বোটিং করেন। প্যাডেল বোটে ৪ জনের লাগে ১০০ টাকা। সকলেই অন্যান্য জায়গায় থাকেন, এখানে শুধু ঘুরতে আসেন।

সাউথ খয়েরবাড়ি কটেজ বুকিং

এখান অনলাইন বুকিং-এর সুযোগ রয়েছে। https://wbsfda.gov.in। ফালাকাটার শিলিগুড়ি বাস স্টপ থেকে মাদারি রোড ধরে সাতপুকুরিয়া বাজার মোড় থেকে বাঁ দিকে ফালাকাটা থেকে মাত্র ১২ কিলোমিটার। আবার মাদারিহাট চৌপথি থেকে বীরপাড়ার দিকে চার কিলোমিটার এগিয়ে বাঁয়ে জঙ্গলের পথে ঢুকে পড়তে হয়। ছ' কিলোমিটার ধরে এই রোমাঞ্চকর পথ পেরলে পৌঁছে যাবেন সাউথ খয়েরবাড়ি ইকো পার্ক। কোচবিহার ডিভিশন (ওয়াইল্ড লাইফ ৩-এর তৈরি এই ইকো পার্ক। এ ছাড়াও ডরমিটারির জন্য ফোন বা স্পট বুকিং করা যায়। ফোন নং- ৯১ ৮৯৭২৩৯৯৭৯৯।

এত চমৎকার নিরিবিলি একটি জায়গা অথচ পর্যটকের রাত্রিবাসের জন্য পছন্দের তালিকায় নেই কেন সাউথ খয়েরবাড়ি ইকো পার্ক? ফেরার পথে ভাবছিলাম, বনমন্ত্রীর সঙ্গে এরপর যেদিন দেখা হবে সেদিন অবশ্যই কথা বলতে হবে এই সাউথ খয়েরবাড়ি নিয়ে। সামান্য যত্ন আর সঠিক প্রচার সাউথ খয়েরবাড়িকে আবার আগের গ্ল্যামার ফিরিয়ে দিতে পারে। ন্যাশনাল পার্ক সাফারিতে অর্থব্যয় করে বড় বড় জন্তুর দেখা না মিললে হতাশ পর্যটক সপরিবারে স্বাদ মেটাতে পারেন এখানে! ইকো টুরিজমের নতুন ধারণা পেয়েছিল পর্যটকরা এখানেই।

ওয়াচটাওয়ারের আশপাশে ছোট ছোট সাইনবোর্ডে বাংলায় ভুল বানান চোখকে পীড়া দিচ্ছিল ঠিক কথা। নদীর ওপর অত সুন্দর সাঁকোটির নড়বড়ে কাঠের পাটাতন ভয় পাইয়েছিল বইকি। রাতে মশা পিঁপড়ের উৎপাতে বিরক্ত হয়ে ভেবেছিলাম, চাইলেই তো বনদপ্তর থেকে মশা-পোকামাকড় তাড়াবার গাছগাছড়া লাগানো যেত অনায়াসেই। আমাদের মতো ছাপোষা সাধারণ পর্যটকদের এইসব ছোট্ট চাওয়াপাওয়াগুলি মেটানোও তো খুব সহজ। আর খয়েরবাড়ির নিবিড় ঘন সৌন্দর্যের সামনে তো এইসব সমস্যা অতি তুচ্ছ, তাই না? ফেরার পথে বুকের ভেতর হারিয়ে যাওয়া শৈশবের উচ্ছ্বাসটা বোধহয় তাই খানিক জেগে উঠেছিল। মনে মনেই বলে ফেলেছিলাম, ইস্ কবে যে আবার চালু হবে সাউথ খয়েরবাড়ির 'ডুয়ার্স লেপার্ড সাফারি'!

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস
ছবি প্রতিবেদক

পালিত হল কোচবিহার রেড ক্রস সোসাইটির জন্মদিবস

কোচবিহার রেড ক্রস সোসাইটির উদ্যোগে গত ৮ মে পালিত হল স্যার হেনরি ডুনান্ট (১৮২৮-১৯১০)-এর জন্মদিবস। স্থানীয় রেড ক্রস ভবনের দোতলায় একেবারে অনাড়ম্বর অথচ আন্তরিক পরিবেশে পালন করা হয় এই বিশেষ দিনটি। আয়োজকদের তরফ থেকে আবেদন করা হয়েছিল স্যার ডুনান্টকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য সামান্য ফুল অথবা ধূপকাঠি নিয়ে আসতে। এই আবেদনে সাড়া দিয়ে ১২২ জন অনুরাগী ওই দিন বিকেলে হেনরি ডুনান্টের ছবিতে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন। আয়োজকের পক্ষ থেকে অরূপ গুহ জানান, 'স্যার হেনরি ডুনান্ট আন্তর্জাতিক রেড ক্রস সোসাইটি গঠন করেছিলেন। আজও সারা বিশ্ব জুড়ে রেড ক্রস সোসাইটি কাজ করে চলেছে। কোচবিহারের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর ১৯৪২ সালে কোচবিহারে রেড ক্রস শাখা স্থাপন করেন। অথচ গত ৩০ বছর যাবৎ এই বিশেষ দিনটি কোচবিহারবাসী পালন করছে না। এ বছর আমরা কোচবিহারবাসীর কাছে মাত্র ১০ মিনিট সময় চেয়েছিলাম। আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে যাঁরা এসেছেন, আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।' **নিজস্ব প্রতিনিধি**

অন্যসুর-এর 'মৈত্রীবার্তা'

গত ৭ মে কোচবিহারে প্রকাশিত হল মৈত্রীসংযোগ সোসাইটির বাৎসরিক পত্রিকা 'মৈত্রীবার্তা'। এটি তাদের তৃতীয় সংখ্যা। পত্রিকাটি উত্তরবঙ্গের প্রথম পত্রিকা, যা রূপান্তরকামী মানুষদের অধিকার নিয়ে কথা বলে। কোচবিহার রেড ক্রস ভবনে এই উপলক্ষে এ বছর থেকে একটি বার্ষিক আলোচনাসভারও আয়োজন করা হয়েছিল। আলোচনার বিষয় ছিল 'নারী চরিত্রে পুরুষ অভিনেতাদের প্রতি সমাজ ও নাট্যজগতের দৃষ্টিভঙ্গি। এবং আমাদের গ্রাম-বাংলাতে নাটক, যাত্রাদল, থিয়েটার ইত্যাদি জগতে নারী চরিত্রাভিনেতাদের অবস্থান'। আলোচনা করেন কোচবিহারের বিশিষ্ট নাট্যকর্মী দীপায়ন ভট্টাচার্য। তিনি আলোচনার মধ্যে শুধু ভারত নয়, গ্রিস, ইংল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে এই

চরিত্রাভিনেতাদের অবস্থান তুলে ধরেন। পত্রিকার সম্পাদক তথা সংস্থার তরফ থেকে সুমি দাস জানান, তাঁদের সংগঠনে এখনও পর্যন্ত ২৫০ জন রেজিস্টার্ড মেম্বার রয়েছেন। বিগত ৭ বছর ধরে তাঁরা রূপান্তরকামী, মেয়েলি পুরুষ, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের নিয়ে কাজ করে চলেছেন। এ দিনের অনুষ্ঠানে প্রত্যয় জেন্ডার ট্রাস্ট কলকাতার পক্ষ থেকে অনিন্দ্য হাজরা উপস্থিত ছিলেন। সুন্দর ও মনোগ্রাহী এই

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল এর মঞ্চসজ্জা। আপেক্ষিক দৃষ্টিতে ব্রাত্য কচুপাতা ও মাটির হাঁড়ি দিয়ে মঞ্চ সাজানো শুধু অনন্য নয়, ভীষণ প্রতীকীও। এর পর থেকে প্রতি বছর এ ধরনের অনুষ্ঠান হবে বলে সুমি দাস জানান।

নিজস্ব প্রতিনিধি

আবৃত্তির জন্য একদিন

গত ১৮ মে ২০১৭ আবৃত্তি নীড় আয়োজন করেছিল স্থানীয় রেলওয়ে ইনস্টিটিউট হলে ডিরোজিও কোচিং ওয়েলফেয়ারের সহযোগিতায় 'আবৃত্তির জন্য একদিন' শীর্ষক অনুষ্ঠান। মঞ্চের আলো জ্বালিয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন অধ্যাপক দিলীপ রায়। সম্মাননা জানানো হয় শহরের বিশিষ্ট কবি নিতাই বসু, ডঃ সঞ্চিতা দাশ, অলোক ভট্টাচার্য, প্রতীপ ঘটক, দিলীপ চৌধুরীকে। সংবর্ধনা জানানো হয় দি ভাইব্রেশন, প্রেরণামুক্ত সাংস্কৃতিক মঞ্চ, কবি উত্তম চৌধুরী ও চিত্রশিল্পী কৌশিক বিশ্বাসকে। এর পর একে একে আবৃত্তি পরিবেশন করেন কুণাল গাঙ্গুলি, পৌলোমী গাঙ্গুলি, পৃথাশ্রী রায়চৌধুরী, ইন্দ্রাক্ষী শর্মা বিশ্বাস, প্রদীপ্ত সরকার, সুপ্রতা সিনহা, সঞ্চিতা দাশ, বিপ্লব দেবনাথ, সোমা চক্রবর্তী, সুমন গোস্বামী। সমবেত আবৃত্তিতে অংশ নেন যথাক্রমে অদ্রিকা, শ্রেয়ান, নিস্নাত, মেধা, সুমেধা, দেবাঞ্জন, বিভোর, সাগ্নিক, কুণাল, বর্ষা, জইতি, সুরচিতা।

আবৃত্তি নীড়-এর পক্ষে সুকান্ত সাহা জানালেন, 'প্রচুর শিশু আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে— এটা খুব ভাল লক্ষণ। প্রতি বছরই আমরা এই ধরনের অনুষ্ঠান করে যাব।' অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন অর্ঘ্য মিত্র। **নিজস্ব প্রতিনিধি**

কবিপক্ষে কবি প্রণাম

সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার সপ্তম এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হল 'কবিপক্ষে কবি প্রণাম' শীর্ষক একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। আয়োজক ডুয়ার্স শিক্ষা সংস্কৃতি মঞ্চ। মুখ্যত তরুণ প্রজন্মের আয়োজকদের এই অনুষ্ঠানের মুখ্য বিষয় ছিল তরুণ প্রজন্মকে রবীন্দ্রচর্চায় নানাভাবে আগ্রহী করা। রবীন্দ্রনাথের জীবনকে নানা আঙ্গিকে তরুণ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরেন অধ্যাপক অর্ণব সেন, বিশিষ্ট শিক্ষক রঞ্জিত মালাকার, নির্মলকুমার ভট্টাচার্য প্রমুখ। তরুণদের এই চর্চাকে সাধুবাদ জানাতে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সুদীপ্ত মাঝি, নাট্যব্যক্তিত্ব সুব্রত দত্ত, নাট্য সংগঠক ও নাট্যাভিনেতা পরিতোষ সাহা, বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক প্রমোদ নাথ, সাহিত্যিক প্রবীর দে প্রমুখ। সংগীতশিল্পীদের মধ্যে অনুমাধব সরকার, দেবলীনা বোস, জলি সূত্রধর প্রমুখের সংগীত পরিবেশন অনন্যতার দাবি রাখে। তবে এই অনুষ্ঠানে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য দিকটি ছিল তরুণ প্রজন্মের স্বরচিত কবিতাপাঠ। বেশ কিছু তরুণ কবির অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। এই কবিতাপাঠে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন গায়ত্রী দেবনাথ, শুভম সাহা, বিকাশকুমার রায় প্রমুখ। বেশ কিছু বাচিক শিল্পীর উপস্থাপনা অন্য মাত্রা দিয়েছে অনুষ্ঠানকে। সেই সঙ্গে শহরের নৃত্যশিল্পীরাও অংশগ্রহণ করেন। প্রায় ২৫ জন নৃত্যশিল্পী সমবেত ও একক নৃত্য পরিবেশন করেন। আয়োজকদের পক্ষে সৈকত মজুমদার, সায়ন ঘোষ, সন্দীপ চ্যাটার্জি, প্রিয়াঙ্ক সাহা প্রমুখ জানান যে, সকল প্রজন্মের মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথ একটি সম্পদ। সম্প্রতি আলিপুরদুয়ারের তরুণ প্রজন্ম এই সম্পদ আহরণে ঠিক ততটা এগিয়ে আসছে না। আমরা তাই এই প্রজন্মকে উজ্জীবিত করার জন্যই মুখ্যত এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। সেই সঙ্গে এই যুগপুরুষটিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো খুব স্বাভাবিকভাবেই এই সংস্থার কর্তব্য। তাই এই আয়োজন। সংস্থার তরফে রিনিক শর্মা বিশ্বাস, পূজা ঘোষ, জয়িস্মিতা মজুমদার প্রমুখ জানান যে, একটি রবীন্দ্র তথ্যচিত্রও নির্মিত হয়েছে এবং একটি স্থানীয় চ্যানেলে বেশ কয়েকবার ইতিমধ্যে তা প্রদর্শিতও হয়েছে। 'হে নূতন' নামে এই তথ্যচিত্রটিতে প্রায় ষাটজন দক্ষ ব্যক্তিত্ব অংশগ্রহণ করেছেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি

বসুন্ধরার কবি প্রণাম

পঁচিশে বৈশাখ সকাল থেকেই আলিপুরদুয়ার সূর্যনগর খেলার মাঠে রবীন্দ্র-জন্মজয়ন্তী পালিত হল। 'বসুন্ধরা' আয়োজিত কবি প্রণাম অনুষ্ঠানে কচিকাঁচাদের ভিড় লক্ষ করা গেল। সংগীত পরিবেশন করেন অনসূয়া বিশ্বাস, দেবলীনা বোস, দেবাশিস ভট্টাচার্য প্রমুখ। সংস্থার পক্ষে সানিয়া পাল জানালেন যে, প্রায় শতাধিক শিল্পী সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন কঙ্ক মুখার্জি।

নিজস্ব প্রতিনিধি

রবীন্দ্রসংগীত কর্মশালা

প্রেরণা-মুক্ত সাংস্কৃতিক মঞ্চের পরিচালনায় গত ১৩, ১৪ ও ১৫ মে ২০১৭ রেল ইনস্টিটিউট আলিপুরদুয়ার জংশনে এক রবীন্দ্রসংগীত কর্মশালার আয়োজন করা হয়। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মৃগাঙ্ক সরকার এই কর্মশালার প্রধান প্রশিক্ষক ছিলেন। প্রথম দিন সকালে ক্লাস ও বিকেলে শ্রীসরকার একেকভাবে অনুষ্ঠান করেন। দ্বিতীয় দিন সকালে ক্লাস ও বিকেলে রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে আলোচনায় অর্ণব সেন, দিলীপ রায়, প্রমোদ নাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তৃতীয় দিনে সকালে ক্লাস ও বিকেলে মূল্যায়ন এবং শিক্ষার্থীদের শংসাপত্র দেওয়া হয়। তা ছাড়া তাল সম্বন্ধে শিক্ষা দেন অমর গায়েন। স্বরলিপি নিয়ে আলোচনা করেন শ্রুতি মজুমদার। প্রতিদিন দুপুরে শিক্ষার্থীদের খাবার দেওয়া হয়। মোট ১৪৫ জন অংশগ্রহণ করে এই কর্মশালায়। আয়োজকদের পক্ষে সসীম নন্দী ও বিপ্লব মজুমদার বলেন, আলিপুরদুয়ারে এই ধরনের কর্মশালায় এই প্রথম এত বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ লক্ষ করা গেল। প্রেরণামুক্ত সাংস্কৃতিক মঞ্চের সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে বিজন দেব রায় ও দেবাশিস ভট্টাচার্য জানালেন যে, শুধু আলিপুরদুয়ার নয়, অন্যান্য জেলার থেকেও বেশ কিছু শিক্ষার্থী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এটা খুব ভাল দিক।

নিজস্ব প্রতিনিধি

এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল গ্রন্থাগার
ডুয়ার্সের একশো বছরের সংস্কৃতির পীঠস্থান

এই অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থাগার হল আলিপুরদুয়ার সপ্তম এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার। প্রথমে এর নাম ছিল সপ্তম এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হল। আলিপুরদুয়ারে ১৯১৭ সালে সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতিতে স্থাপিত হয়েছিল এই গ্রন্থাগার। পরাধীন ভারতবর্ষের অবিভক্ত বাংলার এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রন্থাগার স্থাপন নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। সেই সময়ে মহকুমার বিভিন্ন অফিস-আদালতে কর্মরত আমলা এবং শিক্ষিত মানুষের অবসর বিনোদনের তাগিদেই গড়ে উঠেছিল এই এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হল। পরবর্তীকালে 'হল' শব্দটির অবলুপ্তি ঘটিয়ে লাইব্রেরি শব্দটির ব্যবহার করা হয়।

১৯১৭ সালে এখানে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যাঁদের অবদান, অর্থসাহায্য এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অনস্বীকার্য, তাঁরা হলেন মেসার্স তারাচাঁদ জেঠমল, বাবু শোভাচাঁদ নাহাটা, রাই গুর্জামল, গুরুং বাহাদুর, বাবু রামরতন আগরওয়ালা, বাবু মেটারাম আগরওয়ালা, বাবু আওলাদ সিং, বাবু হরিদাস গাবুর, বাবু রামরূপ সিং এবং তৎকালীন মহকুমাশাসক ইটি কোটস, তহশিলদার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সাহায্য এবং সহযোগিতায় গড়ে উঠেছিল এই গ্রন্থাগার। সেই যুগের গ্রন্থাগারপ্রেমী কিছু মানুষের সমবেত প্রচেষ্টায় যে গ্রন্থাগারের সূচনা হয়েছিল— আজ দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে সেই গ্রন্থাগার অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারে উন্নীত হয়ে শত বৎসরের আলোকে এসে দাঁড়িয়েছে।

আলিপুরদুয়ার পুরসভার বর্তমান ১৫ নং ওয়ার্ডে বকরিবাড়ি এলাকায় এই উদ্দেশ্যে সেই সময় ইটের পাকা বাড়ি নির্মিত হয়েছিল। এখানে বই লেনদেনের পাশাপাশি তাস এবং টেনিস খেলার ব্যবস্থাও ছিল। ১৯১৭ সালে বকরিবাড়ি এলাকায় সপ্তম এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল লাইব্রেরি স্থাপিত হলেও পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে এবং অনিবার্য কারণে এই গ্রন্থাগারের স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে কমপক্ষে চারবার। অনেক ভাঙাগড়ার ইতিহাস পেরিয়ে বর্তমানে এই গ্রন্থাগারটি নিজস্ব ভবনে দাঁড়িয়ে আছে।

১৯৪৯-৫০ সালে গ্রন্থাগার বকরিবাড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার কালজানি ব্রিজের কাছে সারদা কবিরাজমহাশয়ের বাসগৃহের দোতলায় স্থানান্তরিত হয়। কিছুদিন পর এখান থেকে পুনরায় বকরিবাড়ির পুরনো বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। ১৯৫৩-৫৪ সালে আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি বাস স্ট্যান্ডের

কাছে কালু বিশ্বাসের বাড়ির দোতলায় গ্রন্থাগার স্থানান্তরিত করা হয়। এর পর '৫৪-৫৫ সালে স্থানীয় ম্যাকউইলিয়াম ইনস্টিটিউটের দোতলায় এবং পরে নীচতলায় গ্রন্থাগার চালু করা হয়েছিল।

দীর্ঘ পরিক্রমা করে অবশেষে ১৫৫৯ সালে এই গ্রন্থাগার সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত গ্রামীণ গ্রন্থাগারে উন্নীত হয়। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের স্বীকৃতিলাভের সময় এই গ্রন্থাগারের সভাপতি এবং সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে নীলকান্ত মুখোপাধ্যায় এবং ভবেশচন্দ্র মৈত্র। গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বে ছিলেন বিমলেন্দু বিষ্ণু। ১৯৫৯ সালেই বর্তমান ইটখোলায় গ্রন্থাগারের প্রায় এক বিঘা জমি ক্রয় করা হয়। গ্রন্থাগারের নিজস্ব জমি ক্রয় করার বিষয়ে ভবেশচন্দ্র মৈত্র, অনিলরঞ্জন দাস, ভোলা সরকার, জগন্নাথ বিশ্বাস, নির্মলেন্দু বিষ্ণু, মনোরঞ্জন ঘোষ, বিমলেন্দু বিষ্ণু, নীলকান্ত মুখার্জি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি উদ্যোগ গ্রহণ করেন, এবং ২০.০৪.৫৯ তারিখে গ্রন্থাগারের নিজস্ব জমিতে ৩৩ ডেসিমেল জমি গৌরীবালা দাসের কাছ থেকে ক্রয় করা হয়। গ্রন্থাগারের নিজস্ব জমিতে বাড়ি তৈরির জন্য ১৯৬০ সালে ভবেশচন্দ্র মৈত্র, জগন্নাথ বিশ্বাস, নির্মলেন্দু বিষ্ণু এবং অনিলরঞ্জন দাসকে নিয়ে গৃহনির্মাণ কমিটি গঠন করা হয়। জনসাধারণের দানে সংগৃহীত অর্থে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে নিজস্ব বাড়ি রবীন্দ্র ভবন এবং বর্তমানে রামমোহন ভবনে গ্রন্থাগার চলছে। ১৯৭৫ সালে এই গ্রন্থাগার মহকুমা গ্রন্থাগারের মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়। মহকুমা গ্রন্থাগারের মর্যাদা পাবার সময় পর্যন্ত গ্রন্থাগারিক ছিলেন বিমলেন্দু বিষ্ণু। তিনি তাঁর প্রাপ্ত বেতনের সবটাই গ্রন্থাগারে দান করতেন— এটা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। মহকুমা গ্রন্থাগারের স্বীকৃতির সময় গ্রন্থাগারের সম্পাদক ছিলেন সমীরেন্দ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী। ১৯৯৮ সালে এই গ্রন্থাগার উন্নীত হয় অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার হিসেবে। শুরু হয় নতুন অধ্যায়ের। সেই সময়কালে গ্রন্থাগারের সভাপতি এবং সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে অর্ণব সেন এবং অনুজ মিত্র। পরবর্তীতে সম্পাদক ছিলেন প্রবীর গুপ্ত ভায়া মহাশয়। মহকুমা গ্রন্থাগার হবার পর এই গ্রন্থাগারের প্রথম গ্রন্থাগারিক ছিলেন সনৎ সেন, পরে বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমীরকুমার বর্মন। অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার হবার পর গ্রন্থাগারিক ছিলেন দেবাশিস মিশ্র এবং বর্তমানে গ্রন্থাগারিক হিসেবে রয়েছেন জীবনকুমার রক্ষিত। বর্তমান সময়ে নির্বাচিত পরিচালন সমিতি না থাকায় গ্রন্থাগারের প্রধান প্রশাসক হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন শিক্ষাবিদ কনৌজবল্লভ গোস্বামী। যত দূর জানা যায়, ১৯১৭ সালে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত গ্রন্থাগারের কর্মসচিব ছিলেন বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়।

বর্তমানে শতবর্ষের আলোতে দাঁড়িয়ে এই অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার এই অঞ্চলের সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার ঐতিহ্যকে স্মরণ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। বর্তমানে এই গ্রন্থাগারে প্রায় ৩৩ হাজার বই, ৩ হাজার সদস্য, শিশু বিভাগ, সাধারণ বিভাগ এবং অনুলয় বিভাগ (রেফারেন্স সেকশন)-সহ গ্রন্থাগারের কাজকর্ম চলছে। গবেষণাধর্মী কাজের জন্য যাঁরা আসেন, তাঁরা এই বিভাগ থেকে সহযোগিতা পেয়ে থাকেন। লোকসংস্কৃতি গবেষণার জন্য রয়েছে আলাদা করে নির্দিষ্ট পুস্তকসম্ভার। রয়েছে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের চাকরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পত্রপত্রিকা এবং বই। সাধারণ পাঠকক্ষে রয়েছে সাধারণের জন্য দৈনিক এবং সাময়িক পত্রপত্রিকা। রয়েছে প্রাচীন চারটি পুঁথি। প্রায় আড়াইশো বছরের পুরনো এই পুঁথির মধ্যে তিনটি হল মহাভারতের বিরাট পর্বকে অনুসরণ করে লেখা। অন্যটি ধর্মীয় লোকাচার বিষয়ক পুঁথি। ভাষা-সংস্কৃতি। এ ছাড়া গ্রন্থাগারে ১০০ থেকে ১৫০ বছরের পুরনো পুস্তকের ভাণ্ডারও বেশ সমৃদ্ধ। গ্রন্থাগারের আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা জগন্নাথ বিশ্বাস, বিমলেন্দু বিষ্ণু এবং অনুপম তালুকদারের উদ্যোগে ১৯৮৭ সালে এই গ্রন্থাগারের পুরনো পুস্তক, পুঁথি, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের পত্রপত্রিকা এবং বাংলাদেশের পত্রপত্রিকার এক বিরাট প্রদর্শনীর কথা এখনও পুরনো দিনের মানুষের মনে জাগরূক রয়েছে। চিত্রপ্রদর্শনী, আলোচনাসভা, সাহিত্যসভা, বিভিন্ন মনীষীর জন্মদিবস পালনসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল একদা এই গ্রন্থাগার— এ কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়।

বর্তমান সময়ে শতবর্ষের আলোকে দাঁড়িয়ে এ কথা অবশ্যই বলা যায় যে, এই গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল এখানকার সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা। এই এলাকার গ্রন্থাগার আন্দোলনও সংগঠিত হয়েছিল সেই সময় এই গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করেই। গ্রন্থাগারের প্রতি নিবেদিত প্রাণ কিছু মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই এই আন্দোলন সম্ভব হয়েছিল। দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে সে দিনের সেই গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখে আজকের অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারের শতবর্ষ পালনের উদ্যোগ সম্ভব হয়েছে। চলার এই পথ সহজ ছিল না, তবুও

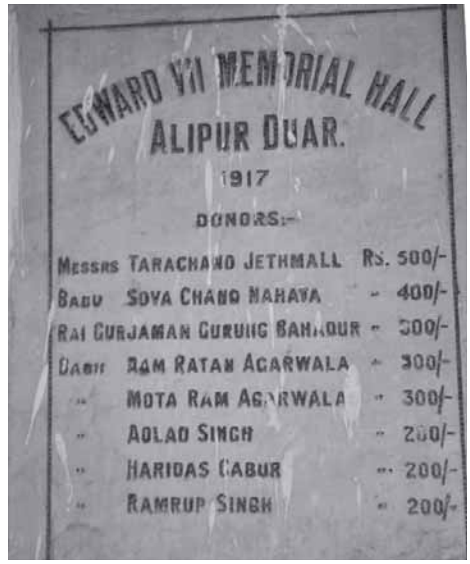

বর্তমান সময়ে শতবর্ষের আলোকে দাঁড়িয়ে এ কথা অবশ্যই বলা যায় যে, এই গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল আলিপুরদুয়ারের সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা। এই এলাকার গ্রন্থাগার আন্দোলনও সংগঠিত হয়েছিল সেই সময় এই গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করেই।

অদম্য উৎসাহীদের প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতিতে কোনও বাধাই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

শতবর্ষের আলোকে আলিপুরদুয়ার অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার সমস্ত বাধা কাটিয়ে বর্তমান প্রশাসকের উদ্যোগে সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পুরনো গৌরব যেমন ফিরে পাবে, তেমনিভাবে বর্তমান কর্মী সমস্যা থেকে গ্রন্থাগারের স্থানাভাবের সমস্যা দূর করে নতুন ভবন নির্মাণসহ অন্যান্য নানা সমস্যার সমাধান করা যাবে— আশাবাদী মানুষ হিসেবে আমরা এই কামনাই করতে পারি। রবীন্দ্রনাথের কথায় আমরা বলতে পারি, 'লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথায় উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোন পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোন পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোন পথ মানব হৃদয়ের অতল স্পর্শে নামিয়াছে। যে যে দিকে ধাবমান হও। কোথায় বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।'

প্রমোদ নাথ

ডুয়ার্সের মেগাসিরিয়াল ৩৩

অরণ্য মিত্র

অবশেষে নিশ্চিত পাত্তা মিলল শুক্লা দাসের। তাকে নজরদারিতে রেখে কী করতে চাইছে দেবমালা যাদব? এ ব্যাপারে কনক দত্তরও প্রবল সমর্থন আছে বোঝা গেল। বিয়ে করার অজুহাতে মনামি বেরিয়ে পড়েছে শিলিগুড়ি ছেড়ে। এখন সে মুক্ত। দীননাথ চৌহানের রিসর্টে তার সঙ্গে পরিচয় হল মায়াঙ্ক নাম্নী যুবকের সঙ্গে। সে 'শকুন্তলা' ডিরেক্ট করবে। কিন্তু দিল্লি থেকে শিলিগুড়িতে উড়ে এসেছেন এক বয়স্ক মানুষ, যাঁর পরিচয় অনুমান করতে পেরে অবাক হয়েছেন নবীন রাই। দুবাই ছেড়ে তিনি এলেন কেন ডুয়ার্সে? কাহিনি এবার বাঁক নিতে শুরু করেছে উত্তেজনাময় পরিণতির দিকে।

৯৭

প্রবল বৃষ্টির মধ্যে বাগডোগরা বিমানবন্দরে দিল্লি থেকে আসা বিমানটা নামল। একজন যাত্রীকে দেখা গেল হেলতে-দুলতে, ধীরপায়ে, হাতে একটা ছোট ব্যাগ নিয়ে বন্দর থেকে বার হতে হতে একটা ফোন করলেন। বাইরে রাস্তায় তাঁর জন্য যে গাড়িটা অপেক্ষা করছিল, সেটা এগিয়ে এল কার পার্কিং-এর জায়গায়। গাড়িতে দু'জন সুঠাম চেহারার যুবক। দু'জনেরই উচ্চতা ছ'ফুটের মতো। ছোট করে ছাঁটা চুল। আগন্তুক গাড়ির সামনে আসতেই একজন দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'গুড মর্নিং দাদা!'

আগন্তুকের মাথার চুল সিংহভাগ সাদা। সাধারণ প্যান্ট আর ঢিলেঢালা একটা শার্ট পরে আছেন তিনি। পায়ের জুতোটা অবশ্য দামি। বয়স সম্ভবত ষাটের আশপাশে হবে। কিন্তু তাঁর চেহারা বেশ বলিষ্ঠ। গাড়ির পিছনের সিটে বসে তিনি বললেন, 'আগে মালগুলো নিতে হবে। সেখানে চলো।'

বৃষ্টির বেগ একটু কমেছে। তবুও জোরে গাড়ি চালাবার পরিস্থিতি নেই। বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে জ্যামজটসংকুল পথ পেরিয়ে গাড়িটা ঘণ্টাখানেক সময় নিল চম্পাসারি মোড় পর্যন্ত আসতে। সেখানে একটা সস্তার হোটেলের সামনে থামল সেই গাড়ি। হোটেলের নীচতলায় খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। সেখানে দু'-চারজন ভাত খাচ্ছিলেন। দুই শক্তিশালী যুবকের একজন গাড়ি থেকে নেমে সেখানে ঢুকল। তার হাতে সাধারণ ব্যাকপ্যাক। অপরজন বসে থাকল স্টিয়ারিং-এ। গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করা হয়নি। যুবকটি একটি টেবিলে একজন নেপালি লোকের মুখোমুখি বসে ব্যাকপ্যাকটা নিচে নামিয়ে পা দিয়ে ঠেলে দিল টেবিলের নিচে। সেখানে হুবহু একরকম দেখতে আরেকটি ব্যাকপ্যাক।

'বলেন সার! মাছ আছে। মাংস আছে, খাসি আর চিকেন। ডিমও পাওয়া যায়।'

হোটেলের কর্মচারী এগিয়ে এসেছে খাওয়ার অর্ডার নেবে বলে। যুবকটি তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভাত ছাড়া কিছু হবে না? টোস্ট আর কফি?'

'ওটা পাশের হোটেলে সার। আমাদেরই ব্রাঞ্চ। বার কাম রেস্টোরান্ট!'

'ওকে।'

যুবকটি উঠে দাঁড়াল। তার হাতের ব্যাকপ্যাকটি ইতিমধ্যে বদলে গিয়েছে। কিন্তু সেটা কোনওভাবেই টের পেল না কেউ। নেপালি লোকটির সঙ্গে একবার চোখের ইশারা বিনিময় করে ব্যাকপ্যাকটি নিয়ে ধীরপায়ে বেরিয়ে যুবকটি গাড়িতে উঠে বলল, 'চলো!'

গাড়ি এবার মূল শিলিগুড়ির দিকে ছুটল। টানা বৃষ্টির কারণে একটু ঠান্ডা লাগছে টের পেয়ে পিছনের সিটে বসা আগন্তুক একটা সিগারেট বার করে ধরালেন। তারপর বললেন, 'একবার দেখে নাও।'

ব্যাকপ্যাকের চেন খুলে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে যুবকটি কিছু নাড়াচাড়া করল। বোঝা গেল যে সে সন্তুষ্ট।

‘এভরিথিং ওকে?’

‘হ্যাঁ দাদা!’ আগন্তুকের প্রশ্নের জবাব দিল যুবকটি, ‘একটা অটোমেটিক রাইফেল। ফোল্ড করা আছে। আর দুটো ফুল অটোমেটিক গ্লক ।’

‘বাকিটা নবীন রাই দেবে। ডান দিকে নাও।’

গাড়ি ঘুরল ডান দিকের অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তায়। এই রাস্তাতেই নবীন রাইয়ের শিলিগুড়ির ফ্ল্যাট। পরিস্থিতি সহজ হওয়ার কারণে এখন শিলিগুড়িতে থাকার সাহস পেয়েছেন নবীন রাই। গাড়ি গলিপথে ঢুকতেই ফোন বার করলেন আগন্তুক। কয়েক সেকেন্ড পর শুনলেন নবীন রাইয়ের দ্বিধামিশ্রিত স্বর, ‘হ্যালো?’

‘ঘাবড়ালে নাকি নবীন?’ মৃদু হেসে বললেন আগন্তুক।

‘কে বলছেন?’

‘তোমাকে এই নাম্বারে যারা ফোন করে, তারা সবাই তোমার পরিচিত তা-ই না?’ আগন্তুক মিটিমিটি হেসে বলতে লাগলেন, ‘আমাকে দেখলেই চিনবে। আমি তোমার ফ্ল্যাটের রাস্তায়। খুব জোর পাঁচ মিনিট। সিকিয়োরিটিকে বলে দাও। তিনজন আছি আমরা।’

‘পরিচয় না জানলে সেটা সম্ভব নয়।’ এবার কড়া গলা শোনা গেল নবীন রাইয়ের।

‘দুবাই থেকে ছুটে আসতে হয়েছে নবীন! এই বয়সে এত ছোটাছুটি পোষায়? আমার গলার আওয়াজটা ভুলে গিয়েছে দেখছি!’

নিজের ফ্ল্যাটে সোফায় এলিয়ে থাকা নবীন রাই এবার তড়াক করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। ফোনটা এ কান থেকে ও কানে নিয়ে সম্ভ্রমের সুরে বললেন, ‘বোসবাবু আপনি? আপনি শিলিগুড়িতে? আনবিলিভেবল!’

আগন্তুক হাসলেন। ডুয়ার্স থেকে শুরু করে গোটা নর্থ-ইস্টে দিল্লি এক্স অ্যান্ড হাই-এর দায়িত্ব দাসবাবুর হাতে তুলে দিয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন দুবাই। সেখানে বাকি জীবনটা আন্তর্জাতিক অপরাধচক্রের হয়ে কাজ করে কাটিয়ে দেবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি বাধ্য করেছে তাঁকে আবার এখানে ফিরে আসতে।

৯৮

নবেন্দু মল্লিকের হত্যা এবং পঁচিশে বৈশাখে আমবাড়ি রেল স্টেশনে বিস্ফোরণে চারজনের মৃত্যু— এই দুইয়ের সংযোগ অনুমান করে মিডিয়ার ব্যস্ততা দিন পাঁচেকের মধ্যে ঝিমিয়ে গেল। বদলে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ লাগবে কি না তা নিয়ে ধুন্ধুমার আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে চারদিকে। ডুয়ার্সে পুলিশের তৎপরতা বেড়ে গিয়েছে রীতিমতো। এমন একটি দিনে মনামি বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। সঙ্গে একটা ছোট ট্রলি ব্যাগ। ভিতরে নিজের ঘরে রেখে গেল মা-বাবার উদ্দেশ্যে লেখা চিঠি। চিঠির বিষয়বস্তু হল, জনৈক মুবারক হোসেন নামের একটি ছেলের সঙ্গে সে সংসার পাতবে বলে বিদায় নিচ্ছে। তার যেন কোনও খোঁজ না করা হয়।

মনামি জানে যে এই চিঠি পাওয়ার পর তার অভিভাবকরা প্রথমে ব্যাপারটা চেপে যাবে। তাদের সোসাইটির ভয় আছে। পরে হয়ত খোঁজখবর শুরু করবে— কিন্তু ততদিনে বিদেশে চলে যাবে মনামি। বিদেশে কাজের সম্ভাবনার বিষয়টা অবশ্য হঠাৎ করে এসেছে তার কাছে। সুরেশ কুমার তার ড্রিম প্রোজেক্ট ‘শকুন্তলা’র কাজ শুরু করতে যাচ্ছে নতুন করে। ডিরেক্টরও নতুন। তার নাম

নিজের ফ্ল্যাটে সোফায় এলিয়ে থাকা নবীন রাই এবার তড়াক করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। ফোনটা এ কান থেকে ও কানে নিয়ে সম্ভ্রমের সুরে বললেন, ‘বোসবাবু আপনি? আপনি শিলিগুড়িতে? আনবিলিভেবল!’

মায়াঙ্ক পাতিল। পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করে চেন্নাইতে ছোট ছোট পর্ন মুভি প্রোডিউস এবং পরিচালনা করছিল এতদিন। বুদ্ধ ব্যানার্জি তাকে ডুয়ার্সে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ছেলেটার কাজ নাকি দেখার মতো।

ডুয়ার্সের একটা রিসর্ট কয়েক দিনের জন্য বুক করে রেখেছে সুরেশ কুমারের দল। সে রিসর্ট নাকি দলের সাময়িক অফিস। শিলিগুড়ি থেকে মনামি চলে যাবে সেই রিসর্টে। আজ সকালেই চেন্নাই থেকে এনজেপি এসেছে মায়াঙ্ক পাতিল। তাকেও আপাতত সেখানে রাখা হবে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। তবে সেই রিসর্টে আরও এক মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে তার। নাম শুক্লা দাস। দু’-একদিনের মধ্যেই তিনি আসবেন সেখানে।

মনামি খুব স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের ফ্ল্যাটটা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সে যে চিরকালের জন্য বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তা একবারের জন্যও বিচলিত করল না তাকে। বরং এক অজানা মুক্তির উল্লাসে তার অন্তর টগবগ করছিল। তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস থেকে গয়েরকাটার বাসে উঠে জানলার ধারে বসে সে ফোন বার করে বার্তা পাঠাল সুষমা আর মুনমুনকে। দু’জনেই শুভেচ্ছা জানাল সঙ্গে সঙ্গেই। কয়েক দিনের মধ্যেই সবরকম কাজকর্ম শুরু হয়ে যাবে। তখন আবার নিয়মিত দেখা হবে জেনে খুব ভালো লাগছিল মনামির। এতদিন বাইরে রাত কাটানোটা ছিল তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। এর জন্য ইচ্ছেমতো কাজ করতে পারেনি সে। এখন আর রাত কোনও বাধা নয়।

গয়েরকাটা হয়ে রিসর্টে পৌঁছাতে পৌঁছাতে প্রায় বিকেল হয়ে গেল। একটা ভ্যান রিকশা নামিয়ে দিল তাকে রিসর্টের গেটে। জায়গাটা মূল জনবসতি থেকে বেশ দূরে। প্রায় এক কিলোমিটার আগে আরেকটা রিসর্ট আছে। মাঝের রাস্তাটা খুব নির্জন। হালকা অরণ্যের মাঝ দিয়ে চলে গিয়েছে।

‘মে হেল্প আই?’

মনামি শুনেছিল যে, এই রিসর্টের ম্যানেজার দীননাথ চৌহানের একটাই সমস্যা, সেটা তার ইংরেজি। সে হাসি গোপন করে দীননাথের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘থাকতে এসেছি।’

‘সরি ম্যাডাম। অল বুক। ফর ফোর ডে। আচ্ছা! আপনি কি বুকিং পার্টির লোক?’

‘তোমাকে জানানো হয়নি আজ কে কে এখানে থাকবে?’

‘সার্টেনলি ইনফর্ম মি।’ পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে দীননাথ তাড়াতাড়ি চোখ বোলায়। ‘ওয়ান লেডিজ অ্যান্ড ওয়ান জেন্স। জেন্স অবশ্য কেইম। প্লিজ ইয়োর নেম ম্যাডাম?’

‘হিমশিখা দাস।’ সুষমার শিখিয়ে দেওয়া নামটা বলল মনামি। এখানে থাকার যাবতীয় ব্যবস্থা সুষমাই করিয়েছে সুরেশ কুমারকে বলে। দীননাথ তার তালিকায় নামটা পেয়ে খুব লজ্জার সঙ্গে বলল, ‘ডোন্ট মাইন্ড ম্যাডাম। আই ফেইলিং আন্ডারস্ট্যান্ড। আপনার জন্য চার নাম্বার রুম। প্লিজ কাম অ্যান্ড হ্যান্ডেল ইয়োর লাগেজ!’

মনামির ট্রলি ব্যাগটা টানতে টানতে এগিয়ে চলল সে। মনামিও পা ফেলল রিসর্টের প্রাঙ্গণে। চমৎকার ছিমছাম ব্যবস্থা। একদিকে আলাদা একটা বাংলো। তার জন্য বরাদ্দ চার নম্বর ঘরটা মাঝারি মাপের হলেও বেশ গোছানো আয়োজন। জানা গেল, এখন টিফিন পাওয়া যাবে। আটটার সময় ডিনার পৌঁছে দিয়ে চলে যাবে দীননাথ চৌহান। গেটের সামনে কাঠের ছোট ঘরটায় থাকবে একজন সিকিয়োরিটি।

মনামি ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকল চিৎ হয়ে। তারপর বাথরুমে ঢুকে ফ্রেশ হয়ে টিফিনের কফি আর টোস্ট খেয়ে

একটা নাইটি শরীরে চাপিয়ে বাইরে এল। গ্রীষ্মের প্রলম্বিত বিকেল তখন গোধূলি ছুঁয়েছে। রিসর্টের পিছনে গাছগাছালি ভরা বাগান। তারপর কাঁটাতারের বেড়া। ওপারে ঘন অরণ্য এবং নদী।

সেই গাছগাছালি ভরা বাগানের জমি পেরিয়ে একজনকে এগিয়ে আসতে দেখল মনামি। লম্বা শরীর। কালো বারমুডার উপর হলুদ টি-শার্ট পরা সেই যুবক মনামির মুখোমুখি হয়ে থমকে দাঁড়াল। মনামি বুঝল এর নামই মায়াঙ্ক পাতিল। সে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকল মায়াঙ্ক পাতিলের বলিষ্ঠ পুরুষোচিত শরীরের প্রতি।

'ইউ মনামি, আই থিঙ্ক?' মায়াঙ্ক মৃদু গলায় ছুড়ে দিল প্রশ্নটা।

'তুমি "শকুন্তলা" ডিরেক্ট করবে?' ইংরেজিতে পালটা প্রশ্ন করে মনামি। 'ডিনারের পর আমরা এ নিয়ে একটু ডিসকাস করতে পারি নিশ্চয়ই?'

'আমার এখানে কোনও কাজ নেই।' ছেলেটি হাঁটা শুরু করে ঘরের দিকে।

মনামি তার পাশে চলতে চলতে বলে, 'আমারও নেই। তবে আকাশ দেখে মনে হচ্ছে বৃষ্টি আসতে দেরি নেই। শিলিগুড়িতে তো খুব বৃষ্টি হচ্ছিল আজ।'

'বৃষ্টির সঙ্গে কি আলোচনার কোনও সম্পর্ক আছে?' মায়াঙ্ক মুচকি হেসে বলল, 'অবশ্য আমি "শকুন্তলা"র একটা সিকোয়েন্স বৃষ্টির মধ্যে রাখার কথা ভেবেছি।'

'সেটা নিয়েই আলোচনা হবে না হয়!' মনামি দাঁড়িয়ে গেল। মুখে রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'ইন ডিটেইল। আমার ঘরটা চার নম্বরে।'

'জানি।' মায়াঙ্ক দাঁড়িয়ে পড়ে, 'আপনার চার আর আমার তিন। দীননাথ বলেছে।'

'দেন আই উইল নক ইউ অ্যাট নাইন।' কথাটা বলে মনামি দ্রুতপায়ে আবার ফিরে যায় বাগানের দিকে। আজ সে যা ইচ্ছে তা-ই করবে, কারণ এটাই তার প্রথম স্বাধীন রাত।

৯৯

দু'দিন টানা গরমের পর জলপাইগুড়ি শহরে ঝড়বৃষ্টি হয়েছে গতকাল শেষ রাতে। এখন ভোর পাঁচটাও বাজেনি। চমৎকার শীতল আবহাওয়ার কারণে ঘুমের আমেজ এখনও ছড়িয়ে রয়েছে শহরে। প্রাতঃভ্রমণকারীর সংখ্যাও নগণ্য। পরি ঘোষালের গুপ্তচর ভিখিরির ছদ্মবেশে একটা দোকানের বারান্দায় চাদর পেতে ঘুমাচ্ছিল। উলটো দিকে সেই ফ্ল্যাটবাড়ি, যেখানে শুক্লা দাস বসবাস করছে বলে ঘোর সন্দেহ। তবে এখনও পর্যন্ত তাকে দেখা যায়নি।

গত রাতের ঝড়বৃষ্টির পর আকাশে এখনও মেঘ। মাঝে মাঝে হাওয়া বইছে। আকাশ ফরসা হয়ে গিয়েছে কিছুক্ষণ হল। একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে গুটিশুটি মেরে শুয়ে থাকতে থাকতে ঝিম ধরে গিয়েছিল গুপ্তচরটির। সেটা আচমকা কেটে গেল গাড়ি থামার শব্দে। চাদরের ফাঁক দিয়ে গুপ্তচর দেখল যে একটা এসইউভি এসে থেমেছে ফ্ল্যাটবাড়িটার সামনে। গলিপথের পাশে দাঁড়ানো গাড়িটা থেকে গুপ্তচরের দূরত্ব খুব বেশি হলে কুড়ি ফুট। সে দেখল যে গাড়িতে চালক ছাড়া আর কেউ নেই। কিন্তু সে গাড়ি থেকে নামল না। বরং ফোন করে কিছু একটা বলল কাউকে।

দেবমালার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, শুক্লা দাস জলপাইগুড়িতে বেশি দিন থাকবে না। সুযোগ পেলেই ফ্ল্যাট ছেড়ে পালাবে। তখন তাকে অনুসরণ করবে রাম পান্ডে। পরি ঘোষালের বাড়ি থেকে সেই ফ্ল্যাটের দূরত্ব মাত্র একটা গলির ব্যবধান।

গুপ্তচরের ইন্দ্রিয় টানটান হয়ে গেল। সে গাড়িটার দিকে পিঠ দিয়ে নিজের ফোনটা বার করে যোগাযোগ করল রাম পান্ডের সঙ্গে। রাম পান্ডে চাকরি করে দেবমালা যাদবের এজেন্সিতে। সে তিন দিন পরি ঘোষালের অতিথি হয়ে একটা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করে আছে। দেবমালার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, শুক্লা দাস জলপাইগুড়িতে বেশি দিন থাকবে না। সুযোগ পেলেই ফ্ল্যাট ছেড়ে পালাবে। তখন তাকে অনুসরণ করবে রাম পান্ডে। পরি ঘোষালের বাড়ি থেকে সেই ফ্ল্যাটের দূরত্ব মাত্র একটা গলির ব্যবধান। তাই দেবমালার অনুরোধে রাম পান্ডেকে নিজের বাড়িতে রাখতে সাগ্রহে রাজি হয়েছেন পরি ঘোষাল।

'গাড়ি নিয়ে গলির মোড়টায় ওয়েট করো। কিছু ঘটতে পারে।' রাম পান্ডেকে সংবাদটা জানিয়ে গুপ্তচর আবার পাশ ফিরল। গাড়িটা একই রকমভাবে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার ইঞ্জিন চালু। এর পর মিনিট পাঁচেক কিছু ঘটল না। তারপরেই হাতব্যাগ নিয়ে শাড়ি পরা এক মহিলাকে ফ্ল্যাট বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। গুপ্তচর তার সমস্ত মনোযোগ চোখে এনে মহিলাটির মুখ দেখার চেষ্টা করল। গাড়ি কাছাকাছি আসতেই মুখটা স্পষ্ট হয়ে গেল গুপ্তচরের দৃষ্টিতে। পুলিশ আর্টিস্টের স্কেচ করা মুখের ছবিটা দেখতে দেখতে মুখস্থ হয়ে গিয়েছে তার। কোনও সন্দেহ নেই যে মহিলাটি শুক্লা দাস।

চকিতে পাশ ফিরে ফোন করল সে। গলিপথটায় গাড়ি ঘোরাবার মতো যথেষ্ট জায়গা না থাকায় এসইউভি-টা একটু এগিয়ে অপেক্ষাকৃত চওড়া একটা জায়গা পেয়ে থেমেছে। ঘুরিয়ে নিয়ে গলির মোড়ে পৌঁছাতে এখনও কয়েক মিনিট লাগার কথা। নিশ্চয়ই রাম পান্ডে গাড়ি নিয়ে ততক্ষণে বেরিয়ে আসতে পারবে। অবশ্য গাড়ির নাম্বারটাও মুখস্থ করে নিয়েছে গুপ্তচর। ভোরবেলায় রাস্তাঘাট ফাঁকাই থাকে। কিন্তু গাড়ি ডুয়ার্সের রাস্তা ধরল, না শিলিগুড়ির দিকে গেল, সেটা বুঝতে না পারলে বিপদ।

'আমি বার হচ্ছি।' হিন্দিতে রাম পান্ডের কথাটা শুনে নিশ্চিন্ত হয় গুপ্তচর। এবার সে উঠে বসে বিরক্ত চোখে তাকাল গাড়িটার দিকে। যেন সকাল সকাল ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়ার জন্য সে বেজায় অখুশি। গাড়িটা কাছাকাছি আসতেই মুখবিকৃতি করে হাত ঝাঁকিয়ে একটা গালি দিল ড্রাইভারকে। সে-ও পালটা একটা গালি ছুড়ে দিয়ে এগিয়ে গেল গলিপথ দিয়ে। গালাগালির ঘটনায় মহিলাটি জানলা দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে একবার তাকিয়েছিলেন গুপ্তচরের দিকে। ফলে, মুখটা চূড়ান্তভাবে মিলিয়ে নিতে কোনও সমস্যা হল না।

খবরটা রাম পান্ডে হয়ে ভায়া দেবমালা পৌঁছে গেল কনক দত্তর কাছে। তিনি আর্লি রাইজার হলেও ধূপগুড়িতে শীতল আবহাওয়ার কারণে ঘুমাচ্ছিলেন। দেবমালার কাছে খবর পেয়ে নবযুবকের মতো উৎসাহে লাফিয়ে উঠলেন বিছানার উপর। স্ত্রী গম্ভীর সুরে বললেন, 'ফুটবল খেলছ নাকি?'

কিন্তু স্ত্রীর কটাক্ষে কান না দিয়ে মশারি থেকে বেরিয়ে এসে কনক দত্ত জানতে চাইলেন, 'কোন দিকে যাচ্ছে শুক্লা দাসের গাড়ি?'

'তিস্তা ব্রিজ পেরিয়ে ময়নাগুড়ির দিকে যাচ্ছে। মনে হয়, ডুয়ার্সের কোথাও যাবে।'

'এর পর কী করবে? ওকে গ্রেপ্তার করার কোনও রাইট কিন্তু তোমার নেই!'

'যতটা পারব, ফলো করব।' দেবমালা জানাল, 'যাঁর রিকোয়েস্টে আমরা এই কেসে আপনাকে কোঅপারেট করছি, সেই মিনিস্টারের কাছে রিপোর্ট করে চেষ্টা করব ওকে গ্রেপ্তার করানোর। এটা কতটা সম্ভব তা অবশ্য জানি না। কিন্তু আমরা যদি ওকে রেগুলার ফলো করতে থাকি, তবে প্রচুর ইনফর্মেশন পাব। আর—।'

'আর কী?'

'উই ক্যান কিডন্যাপ হার।'

'পুলিশ-মন্ত্রী দিয়ে কিছু হবে না দেবমালা!' কনক দত্ত গভীর গলায় বললেন এবার, 'লেট আস কিডন্যাপ হার।'

(ক্রমশ)

উত্তরঙ্গ তরঙ্গ

আজ ষষ্ঠী। টাউনের বাবুদের একটা অংশ পুজোর ছুটিতে দেশের বাড়ি ফিরে যাবে বলে প্রস্তুত হচ্ছে। রাত দশটার উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে তিলধারণের জায়গা থাকবে না আজ। দু'-চারটি বারোয়ারি পুজো বাদ দিলে টাউনের বেশির ভাগই কোনও না কোনও বাড়ির পুজো। আর্য নাট্যসমাজের সদস্যরাও পুজো করছেন। পুজোর পর তাঁদের বিখ্যাত বিজয়া সম্মিলন। সে নিয়ে আজ বিশেষ মিটিং হবে বিকেলবেলা। সদস্যরা একে একে ভিড় জমাতে শুরু করেছেন প্রাঙ্গণে। সমাজের সামনেই করলা নদী। লাগোয়া ঘাটে এসে নামছে কেউ কেউ। করলায় আজ অনেক নৌকো। বেশির ভাগ নৌকোই এখন ছুটছে তিস্তার দিকে। শহরে এখন বেশ ব্যস্ততা।

একটি লোক ছোট একখানা নৌকো থেকে নামল সমাজের ঘাটে। নৌকোতে সে একাই যাত্রী। মাঝিকে পয়সা মিটিয়ে লোকটি আর্য নাট্যের প্রাঙ্গণের দিকে একবার অলস চোখে তাকিয়ে রাস্তায় উঠে হাঁটতে শুরু করল। বোঝা যাচ্ছিল যে তার বিশেষ তাড়া নেই। পশ্চিম দিকে কিছুটা এগিয়ে গাছপালায় ঢাকা কালী মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখতে লাগল সে। তারপর একটি কমবয়সি ছেলেকে উদ্দেশ্য করে হাঁক দিয়ে বলল, 'একটু দাঁড়াবেন ভাই!'

পনেরো-ষোলো বছরের ছেলেটি আর্য নাট্যের দিকে হেঁটে যাচ্ছিল। হাঁক শুনে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, 'কিছু বলবেন?'

'দর্জিপাড়াটা ঠিক কোন দিকে?'

'এই তো, দক্ষিণের রাস্তা ধরে সোজা চলে গেলে পেয়ে যাবেন। সেখানে কার বাড়িতে যাবেন?'

'রজনীবাবুর বাড়ি।'

'চলে যান। সে বাড়িতে পুজো হচ্ছে। ওদিকে ওই একটা বাড়িতেই হচ্ছে পুজো।'

লোকটি একটু হেসে ধন্যবাদ জানিয়ে হাঁটতে লাগল। পথ বেশি নয়। মিনিট দশেক হাঁটার পর আরও একজনকে জিজ্ঞেস করে রজনীবাবুর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল লোকটি। বাড়ির সামনেই চণ্ডীমণ্ডপ। সেখানে ছোট ছেলেমেয়েরা হুল্লোড় করছে। একান্নবর্তী এই পরিবারে মহেন্দ্রর জন্য কিছুটা বিষাদ কাজ করলেও পুজোর আনন্দে ভাটা পড়েনি। লোকটি কয়েক মিনিট চণ্ডীমণ্ডপের সামনে দাঁড়িয়ে থাকল। রজনীবাবু তাকে চেনেন না। কিন্তু তার আসার সংবাদ নিশ্চয়ই চিঠিতে জেনে গিয়েছেন। চিঠিতে লেখা হয়েছিল যে, পুজোর ঠিক আগে দেখা করবে একজন। সে টাকা নিয়ে যাবে মহেন্দ্রর জন্য।

'মশাই কাউকে খুঁজছেন নাকি?'

বছর কুড়ি-বাইশের একটি তরুণ এগিয়ে এল। মনে হয় সে এ বাড়িরই ছেলে। তার মুখাবয়বের সঙ্গে মহেন্দ্রর বেশ সাদৃশ্য আছে।

'রজনীবাবু আছেন নাকি?'

'কাকা? কাকা তো দু'-তিন দিন ধরে বাড়ি থেকে বার হচ্ছে না।' সে বলল, 'কেউ একজন জরুরি খবর নিয়ে নাকি আসবে। ব্যবসার খবর। তা আপনি কি সেই ব্যক্তি?'

'সেই ব্যক্তি কি না জানি না।' লোকটি স্মিত হেসে জানায়, 'তবে আমি আসব জানিয়ে চিঠি লেখা হয়েছিল।'

'ওই দরজা দিয়ে চলে যান। বৈঠকখানাতেই পেয়ে যাবেন।'

কথাটা বলে তরুণ ছেলেটি মণ্ডপের হুল্লোড়ের দিকে এগিয়ে গেল। লোকটি ধীরপায়ে বৈঠকখানায় ঢুকে দেখল, রজনীবাবু বসে আছেন। সে রজনীবাবুকে প্রথম দেখছে। কিন্তু মহেন্দ্রর মুখে বাবার চেহারার বর্ণনা এতবার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শুনেছে যে, দেখামাত্র চিনতে কোনও অসুবিধেই হল না। সে বিনীত সুরে বলল, 'ভিতরে আসব?'

'কাকে চাই?' আগন্তুককে দেখে রজনীবাবু নড়েচড়ে বসলেন। কারণ লোকটি রীতিমতো অপরিচিত।

'আজ্ঞে চিঠিতে বলা হয়েছিল, পুজোর ঠিক আগেই আসব।'

রজনীবাবু কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলেন আগন্তুকের মুখে। তারপর উঠে এসে ভিতরে যাওয়ার দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, 'বসুন।' তারপর হাঁক দিয়ে ডাকলেন, 'কেতো! এই কেতো!'

বাইরে থেকে একটা হেটো ধুতি পরা লোক দৌড়ে এসে বলল, 'আজ্ঞে!'

'বাইরে বসে থাক। কাউকে ঢুকতে দিবি না!'

রজনীবাবু আগন্তুকের মুখোমুখি বসলেন। বোঝাই যাচ্ছে যে, ভিতরের উত্তেজনা গোপন করে তিনি স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছেন। লোকটি এর মধ্যে ফতুয়ার পকেট হাতড়ে একটা ভাঁজ করা কাগজ বার করেছে। সেটা রজনীবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'মহেন্দ্রর চিঠি। নিজেই লিখেছে।'

রজনীবাবু ব্যগ্র হাতে কাগজটা নিলেন। সংক্ষিপ্ত পত্র। মা-বাবা এবং বড়দের বিজয়ার আগাম প্রণাম জানিয়ে সে লিখেছে, পত্রবাহকের নাম জীবানন্দ। তার হাতে অন্তত এক হাজার টাকা যেন দেওয়া হয়। সে পুজোর ক'দিন জলপাইগুড়িতেই থাকবে। যাওয়ার আগে নিয়ে যাবে টাকা।

'যদি আমার একটি সন্তান দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করে, তবে আমি শেষ পর্যন্ত গর্বিত হব। তবে যা-ই হোক না কেন, সন্তান তো! আমার ছেলে বলে বলছি না— সে বড় গুণী ছেলে। কিন্তু বাঘের সঙ্গে গুলতি নিয়ে লড়াই করতে যাওয়াটা বীরত্ব নয়, বোকামো। তোমাদের প্ল্যানটা ঠিক কী?'

বারকয়েক চিঠিটা পড়ার পর রজনীবাবু চোখের জল গোপন করলেন না। ধুতির খুঁটটা দিয়ে চোখ মুছে একটু ধরা গলায় বললেন, 'টাকা আমি আজই দিয়ে দিতে পারি। কিন্তু সে তুমি যাওয়ার আগে নিয়ে যেয়ো। বেশি দিতে পারব তবে। কিন্তু আগের চিঠিটা সে নিজে লিখল না কেন?'

'গুলি ছোড়া রপ্ত করতে গিয়ে কবজি মচকেছিল।' জীবানন্দ নিচু গলায় জানাল, 'এখন সে পুরোপুরি সুস্থ।'

'কোথায় আছে সে?'

'জায়গাটা বলতে পারব না। বলার নিয়ম নেই। তবে ডুয়ার্সেই।'

'কী করতে চাও তোমরা? দশটা-বারোটা বন্দুক আর কয়েক ডজন বোমা নিয়ে ব্রিটিশ তাড়াবে? গান্ধিজির উপরে আস্থা নেই তোমাদের?'

'তিনি নমস্য। কিন্তু প্রত্যেকের অধিকার আছে নিজের পথ বেছে নেওয়ার।' জীবানন্দ তেমনই নিচু সুরে বলল। রজনীবাবু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন তার দিকে। তিনি বুঝতে পারলেন এই জীবানন্দ নামের যুবকটিও শিক্ষিত। মলিন ধুতি আর ফতুয়ায় ঢাকা শরীরে অযত্নের স্পষ্ট ছাপ থাকলেও চোখ দু'টি বলে দেয় অনেক কথা।

'লেখাপড়া কদ্দূর করেছ?'

'আইএসসি। তারপর বাড়ি থেকে পালিয়েছিলাম। বিদ্যাসাগরমশাইয়ের দুটো গ্রাম পরে আমার বাড়ি। পুলিশ সন্দেহ করায় পালিয়ে আসি। আলিপুরদুয়ারে থাকতাম মঘা দেওয়ানের আশ্রয়ে। সেখানে উপেনের সঙ্গে আলাপ। তারপর মহেন্দ্র চলে আসে।'

'ওকে ফিরে আসতে বলো। তোমরাও চলে এসো। এখানে সংঘ বানাও। মানুষের জন্য কাজ করো। টাকাপয়সার চিন্তা করতে হবে না। কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লবের কথা ভুলে যাও। এ পথ ভালো নয়। দেশ স্বাধীন হলে তোমাদের মতো ছেলেদের দরকার হবে জীবানন্দ!'

রজনীবাবু কিঞ্চিৎ আবেগবিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন বলতে বলতে। জীবানন্দ চুপ করে মাথা নিচু করে বসে থাকল।

'ভেবে দেখো,' একটু পরে স্বাভাবিক গলায় বললেন তিনি, 'যদি আমার একটি সন্তান দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করে, তবে আমি শেষ পর্যন্ত গর্বিত হব। তবে যা-ই হোক না কেন, সন্তান তো! আমার ছেলে বলে বলছি না— সে বড় গুণী ছেলে। কিন্তু বাঘের সঙ্গে গুলতি নিয়ে লড়াই করতে যাওয়াটা বীরত্ব নয়, বোকামো। তোমাদের প্ল্যানটা ঠিক কী?'

'বক্সার জেল ভাঙব।'

মাথা নিচু করে বিনীত সুরেই বলল জীবানন্দ। রজনীবাবু স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকলেন তার দিকে। বাইরে ঢাক বাজতে শুরু করেছে। সেই ছন্দোময় গমগমে ধ্বনির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে ছোটদের হুল্লোড়। চটপট শব্দে ফাটতে শুরু করেছে চিনে পটকা। সেই আনন্দধ্বনির মধ্যে জীবানন্দর মৃদু স্বর সব কিছু ছাপিয়ে গমগম করতে লাগল তাঁর কানে।

'আমি ভিতরে যাচ্ছি। মহেন্দ্র যে জীবিত আর সুস্থ আছে, সেটা জানার পর পুজোর আনন্দটা একটু হলেও বাড়বে। তুমি কবে আসবে টাকা নিতে?'

'কোজাগরী পূর্ণিমার দিন। সন্ধের পরে।'

'যাওয়ার আগে মিষ্টিমুখ করে যেয়ো।' রজনীবাবু দ্রুতপায়ে দরজা খুলে অন্দরে চলে গেলেন। কিন্তু জীবানন্দ তাঁর মিষ্টিমুখের নির্দেশ উপেক্ষা করে ধীরপায়ে বেরিয়ে এল বাইরে। একটু দূরত্ব রেখে তাকে অনুসরণের জন্য তৈরি হল কেতো নামের চাকরটি। সে আসলে বীরেনের নিয়োগ করা লোক।

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: দেবরাজ কর

ডুয়ার্স থেকে শুরু

চেন্নাইয়ে চেন রিঅ্যাকশন

রেল কোম্পানির আই-ডি কি প্লেন কোম্পানি নেবে? কাজের সূত্রে লেখক ছুটছেন চেন্নাই, কারণ রহস্যময় ‘ফগ’। ফগের রহস্যে আবার ফেলু মিত্তিরের প্রবেশ। ‘টিনটোরেটোর যীশু’ কি অভিশপ্তই হয়ে গেল? ডুয়ার্সে নিজের শহরে বসে একদিন সত্যজিৎ রায়ের সইয়ের উপর অজস্রবার হাত বুলিয়েছিলেন লেখক, এবার তাঁর সৃষ্ট কাহিনি লেখককে দৌড় করাচ্ছে বিমানবন্দরের দিকে। যেতে যেতে শুনছেন ভালো ইংরেজি বলার টোটকা। এ এক জমাটি ধারাবাহিক।

—মাংস না খেলে কখনওই ভাল ইংলিশ বলা যায় না...

ভোঁপ ভোঁপ করে জোর হর্ন বাজিয়ে একটা বাসকে ওভারটেক করল আমার ট্যাক্সি। ড্রাইভার সাহেব স্টিয়ারিং কাটিয়ে গাড়িটিকে রাস্তার মাঝবরাবর এনে ফেলে তারপর আবার শুরু করলেন— এটা ছেলের স্কুলের দিদিমণি বলেছে, বুঝলেন। দাঁতের শেপ ঠিক না হলে ইংরেজিতে সুবিধে করা যায় না। তার জন্য ভাল করে মাংস চিবুতে হবে, হাড় চিবুতে হবে। কী? কথাটা ঠিক কি না?

আর্লি মর্নিং ফ্লাইট ধরার তাড়ায় পথে বেরিয়েছিলাম একদম ব্রাহ্মমুহূর্তে। কারণ, থাকি কলকাতার প্রত্যন্ত প্রান্তে, যেখানে ভোরবেলায় চট করে ট্যাক্সি পাওয়া মুশকিল। আজকে অবশ্য অপেক্ষার মিটার মিনিট পাঁচেক ঘুরতে না ঘুরতেই গাড়ি পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তখন কে জানত যে কপালে এমনই ট্যাক্সি জুটেছে, যার চাকা এবং ড্রাইভার সাহেবের বকা— দুটোই ননস্টপ চলে!

—কী স্যার? কিছু বলুন?

রিয়ার ভিউ মিররে ড্রাইভার সাহেবের প্রতিচ্ছবি আমার উদ্দেশে ভুরু নাচাল। আমি আড়চোখে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম, বাগুইআটি মোড় পেরচ্ছি। অর্থাৎ মিনিট দশেকের মধ্যেই এয়ারপোর্ট পৌঁছে যাব।

এতটা পথ ধরে এতক্ষণ আন্দামানে আলুর দর থেকে শুরু করে (ড্রাইভার সাহেব প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, আশি টাকা কিলো) মাংসাশীরা ইংরেজি ভাল বলে বিষয়ক লাগাতার আলোচনা চলছিল। এবারে তার থেকে নিস্তার পেতে আর বেশি দেরি নেই বুঝে, আমি অল্প কথায় তাকে নিরস্ত করতে চাইলাম...

—সেটা হতেও পারে। সাহেবমাত্রই তো প্রচুর মাংস-টাংস খায়।

এই উত্তর শুনে ড্রাইভার সাহেব অতীব উৎফুল্ল হয়ে বললেন, একদম ঠিক ধরেছেন স্যার। শুধু গাদা গাদা নিরামিষ খেলে সাউথ ইন্ডিয়ানদের মতো উলটোপালটা ইংলিশ বলতে হবে। হা হা হা, একদম কমেডি ইংলিশ!

লোকটাকে বলাই যেত যে উলটোপালটা নয়, দক্ষিণ ভারতীয়রা একটু বিচিত্র উচ্চারণে ইংরেজি বলেন মাত্র। আর তাঁদের গ্রামারে কদাচিৎ ভুল থাকে। আসলে আমি নিজেই এখন দক্ষিণ ভারতে যাচ্ছি জরুরি দরকারে। তাই কোথাও যেন একটা সংস্কার কাজ করছে, যে ওখানকার বাসিন্দা সম্পর্কিত অপপ্রচারে সায় দিলে যদি কাজটা ভেস্তে যায়? প্রতিবাদ করব কি করব না, ভাবতে ভাবতেই ফোন বেজে উঠল। নাম্বারটা দেখে আমি ফোন কানে দিলাম।

—হ্যাঁ সাগ্নিক, বলো?... আমি প্রায় পৌঁছে গিয়েছি। তুমি কত দূর? আর

বাবুদা... ?

আকাশে উড়তে গিয়ে চূড়ান্ত বিভ্রাটে জটায়ু। বাদ নেই ফেলুদা আর তোপসেও। সেই তিন মূর্তি কতটা ঝাপসা, আপাতত সেটা খতিয়ে দেখতেই সাতসকালে চেন্নাইয়ের ফ্লাইট ধরতে ছুটছি, আমরা চার মূর্তি। বাবুদা অর্থাৎ পরিচালক সন্দীপ রায়। ছবির সহকারী পরিচালক সাগ্নিক এবং সহকারী চিত্রগ্রাহক শশাঙ্ক। আর প্রযোজক সংস্থার তরফে রয়েছি আমি। গন্তব্য চেন্নাইয়ের প্রসাদ ল্যাবরেটরি।

গতকাল বিকেলেই সেখানে প্রসেস হয়েছে ছবির শেষ শিডিউলের ফিল্ম রোলগুলো। আর তাতে রয়েছে ফেলুদা অ্যান্ড কোং-এর হংকঙের যাবতীয় কীর্তিকলাপ। অর্থাৎ সত্যজিৎ রায়ের 'টিনটোরেটোর যীশু' গল্পে যেমন যেমন ঘটনার বর্ণনা রয়েছে রহস্যের ক্লাইম্যাক্সে।

কিন্তু আমাদের সিনেমার ক্লাইম্যাক্সের মুখে আপাতত চুন-কালি পড়ার জোগাড়। কারণ সেই মর্মেই ল্যাব থেকে মারাত্মক দুঃসংবাদবাহী একটি ফোন এসেছিল, সরাসরি পরিচালকের কাছে। গতকাল রাত আটটা নাগাদ।

ফিল্মে নাকি ফগ ধরেছে!

ভূতে ধরেছে বললেও চলে। কারণ ঠিকমতো ফগ ধরলে ফিল্মের ছবি প্রায় ভৌতিকরকম আবছা হয়ে যায়। হে ভগবান! ফিল্ম যদি সত্যিই তেমন ফগ-বান হয়, তাহলে কলাকুশলীসহ অনেকেরই সটান অজ্ঞান হওয়ার দশা, কেউ রুখতে পারবে না!

এখনকার ডিজিটাল ফোটোগ্রাফির যুগে দশজনে নয়জনই হয়ত এই সংকট বুঝবেন না। কিন্তু এক যুগ আগে সত্যিই এমন একটা সময় ছিল। যখন ছবি তোলার পর ডার্ক রুমে ফিল্মটি কেমিক্যালে ফিক্স না করা অবধি তাতে সাদা আলো লাগানো ছিল বারণ। ডার্ক রুমে লাল আলো তবুও চলবে। কিন্তু কোনওক্রমে সাদা আলো জ্বললেই ফিল্মটিও জ্বলে শেষ। পিকচারের কপালে ডিরেক্ট লাল বাতি!

আমাদের উপরোক্ত ছবিটির ক্যানগুলো ক্ষতিকররকম আলোকিত হল কীভাবে, সে বিষয়ে আলোকপাত করা অবশ্য খুব কঠিন ছিল না। কালপ্রিট হল হংকং বিমানবন্দরের এক্সরে স্ক্যানার মেশিন। একে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। তার উপর আবার গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল এবং চৈনিক মাফিয়া ট্রায়েড-এর ঘন বসতির মাঝখানে তার অবস্থান। ফলে সে এয়ারপোর্টে স্ক্যানারের শক্তি সাধারণ এক্সরের চেয়ে আট গুণ বেশিই হবে। সিধুজ্যাঠা থাকলে ঠিক বলে দিতেন, সিকিয়োরিটি চেক-এর সময় এক্সরে মেশিনের জঠরে আনপ্রসেসড ফিল্ম ক্যান

কালপ্রিট হল হংকং বিমানবন্দরের এক্সরে স্ক্যানার মেশিন। একে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। তার উপর আবার গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল এবং চৈনিক মাফিয়া ট্রায়েড-এর ঘন বসতির মাঝখানে তার অবস্থান। ফলে সে এয়ারপোর্টে স্ক্যানারের শক্তি সাধারণ এক্সরের চেয়ে আট গুণ বেশিই হবে।

দুম করে ঢুকিয়ে বোসো না। আগে এয়ারপোর্ট টেকনিশিয়ানদের বলো, হা রে রে রে পাওয়ারের এক্সরেটা একটু কম করতে। অভিজ্ঞ শুটিং পার্টিরা সেটাই করে থাকে, আমরা পরে জেনেছিলাম। নয়ত, বিশ্বের নানান দেশের কম ফিল্ম তো আর হংকঙে শুট হয় না। সবাই কি তারা ফগ মাখা ফিল্ম নিয়ে খুশিতে ডগমগ হয়ে দেশে ফিরে যায়?

যা-ই হোক। আমাদের ক্ষেত্রে 'গতস্য শোচনা নাস্তি'। গোল খেয়ে যাওয়ার পরে আর ডিফেন্স মজবুত করার টিপস জেনে কী লাভ? তাই আসল ক্ষতির বহর খতিয়ে দেখতে, অতি তাড়াহুড়োর মধ্যে রাতারাতি টিকিট বুক করা হয়েছে। সাতসকালে চলো চেন্নাই।

দমদমে ডোমেস্টিক টার্মিনালের সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে দেখি শশাঙ্কও ফগ ধরা ফ্যাকাশে মুখে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যামলেটের 'to be or not to be'-র মতো দোদুল্যমান দশা। শোকে মুহ্যমান হবে নাকি হবে না, সেই কনফিউশনের সপাট মলাট তার চাঁদবদনে। আর সেটা হওয়াটাই স্বাভাবিক। হংকঙের ভিক্টোরিয়া ডকে দু'রাত ধরে শুটিং। তার মধ্যে একরাত আবার ওখানকার স্থানীয় শৈলীর বাহারি পালতোলা নৌকো ডুক-লিং-এর ডেকের উপর। সেইসব অসাধারণ দৃশ্যের ছবি যদি মার যায়, ক্যামেরাম্যানের তো মরে যেতে ইচ্ছে করবেই! আমাকে দেখে সে হতাশ স্বরে বলল, কী অভিশাপ লেগেছে বলো তো এই ছবিতে? কিছুতেই কমপ্লিট হতে দিচ্ছে না!

—আরে বাবা, কমপ্লিট হবে। একটা না একটা রাস্তা বেরবেই, দেখো!

খুব জোর গলায় আমি ওকে ভরসা জোগালাম। নিজের বুকে মৃদু অস্বস্তির খচখচানি নিয়েও তখন আমি চূড়ান্ত অপটিমিস্ট। যদিও খচখচানির পুরোটা ফিল্মের ফগজনিত সমস্যার কারণে নয়। আসলে কাল রাতে অনেক খুঁজেও বাড়িতে আমার ফোটো আই-ডি-টা পাওয়া যায়নি। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সঙ্গে যা নিয়ে এসেছি, দেখলে অনেকে আঁতকে উঠতে পারেন। কিন্তু আমি ঢিপঢিপ করা বুকেও অপটিমিস্ট, যে ওটা দেখিয়েই বিমানের বোর্ডিং পাস আদায় করা যাবে। আর তা যদি করা যায়, তবে ফগে ধরা ফিল্ম মেরামত কেন করা যাবে না?

—কবে থেকে ঝুলে আছে ছবিটা, ভাবো তো? শশাঙ্ক ঘড়িতে এক ঝলক চোখ বুলিয়ে বলল।

আমি সম্মতিতে মাথা নাড়লাম, ঠিকই। আমরা 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি' এই ছবির কত পরে শুরু করেছিলাম। দেখো, সেটা রিলিজ হয়ে বছর ঘুরতে চলল!

—আরে, সেই জন্যই তো বলছি, এই ছবিটা বোধহয় অভিশপ্ত! ছবির শুরুতে ওই জ্যোতিষীর সিনটা রাখার জন্য এরকম হল কি না কে জানে?

দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল। জটায়ু তাঁর নতুন উপন্যাসের টাইটেল ঠিক করার জন্য জ্যোতিষীর পরামর্শ নিতে এসেছেন মফস্সলের একটি জায়গায়। সঙ্গী ফেলুদা এবং তোপসে। সেখান থেকেই 'টিনটোরেটোর যীশু' সিনেমাটির শুরু।

টেকনিক্যালি দেখলে, 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে'র পর বড় পরদার জন্য সন্দীপ রায় পরিচালিত দ্বিতীয় ফেলুদা হওয়ার কথা ছিল এই 'টিনটোরেটোর যীশু'র। ছবির প্রায় ষাট শতাংশ শুটিংও শেষ হয়ে গিয়েছিল, যার মধ্যে ছিল ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ি এবং মধ্যপ্রদেশের খেজারগাঁওয়ের মতো লোকেশন। কিন্তু তারপর গোল বেধে গেল হংকং অংশের শুটিং নিয়ে। ছবির তৎকালীন প্রযোজকরা খরচ বাঁচানোর জন্য চাইছিলেন যে ওই শুটিংটা ব্যাংককে করা হোক। কিন্তু মূল গল্পে যেহেতু হংকং আছে, সন্দীপ রায় সেটা নিয়ে কোনওমতেই আপস করতে রাজি হননি। এই টানাপোড়েনের ফলে শেষ পর্যন্ত মাঝপথে ছবির কাজই বন্ধ হয়ে যায়।

এর প্রায় এক বছর পরে তিনি আমাদের প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে পরবর্তী ফেলুদার ছবির কাজ শুরু করেন। 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি'। যে ছবির শুরুতেই রয়েছে বিমান দুর্ঘটনার দৃশ্য। তারপর দেখাতে হয়েছে বিমানের ধ্বংসস্তূপও। কলকাতায় বাইপাসের ধারে একটি মাঠে সেই প্রমাণ সাইজ বিমানের মডেল বানানো হয়েছিল। একটি বাঙালি প্রোডাকশন হাউস সিনেমার দরকারে এতটা খরচ করতে পিছুপা নয় দেখে আলাদা একটা ভরসা জেগেছিল সন্দীপ রায়ের মনে। তাই আমাদের হাউসকেই তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন অসম্পূর্ণ 'টিনটোরেটোর

যীশু'র প্রোজেক্টটি হাতে নেয়ার জন্য। আমরাও সানন্দে রাজি হয়ে যাই। কারণ এই ছবিতেই প্রথমবার ফেলুদার শুটিং বিদেশের মাটিতে হবে। সেদিক থেকে একটি উল্লেখযোগ্য 'প্রথম' তো বটেই!

এখানে আমার কথা একটুখানি না বললেই নয়। 'সোনার কেল্লা' প্রথমবার দেখেছিলাম জলপাইগুড়ির রূপমায়া সিনেমা হলে। চ্যারিটি শো-তে। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'ও তা-ই। তবে সেটার শো ছিল রূপশ্রীতে। 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি' পড়েছিলাম বই আকারে। সৌজন্য আজাদ হিন্দ পাঠাগার। আর 'টিনটোরেটোর যীশু' শারদীয়া দেশ পত্রিকায়। এসবই স্কুলের গণ্ডি ছাড়ানোর আগের ঘটনা। বলতে গেলে, ওই সৃষ্টিগুলোর অনুপ্রেরণাতেই আমার অতি সামান্য লেখালেখি ও আঁকিবুকির অভ্যেসের শুরু। সেই সময় কিছুদিন একটা ছোটদের পত্রিকাও প্রকাশ করেছি, যার প্রথম সংখ্যার জন্য অতি দুঃসাহসের সঙ্গে লেখা চেয়ে বিশপ লেফ্রয় রোডের ঠিকানায় চিঠি পাঠিয়েছিলাম ওই দীর্ঘদেহী প্রবাদপ্রতিম মানুষটির কাছে। আর জবাবও পেয়েছিলাম সেই চিঠির। সময়ের অভাবে লেখা দিতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। কিন্তু আমার ওই অকিঞ্চিৎকর শিশু পত্রিকার জন্য নিজের হাতে একটি শুভেচ্ছাবার্তা লিখে দিতে ভোলেননি। উত্তরবঙ্গ ছাড়ার কালে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল চিঠিটা। তবে তার আগে অবধি, কত লক্ষবার যে হাত বুলিয়েছি ওই হাতের লেখা আর সইটার উপর! কলেজ ও ইউনিভার্সিটি লাইফ জুড়ে তখন কেরিয়ার তৈরির প্রথাগত চাপ ঘাড়ের উপর। প্রায়ই শুনতে হত, লেখালেখি, আঁকাআঁকি, নাটক... এসবই শখের জিনিস। ওসবের ভরসায় জীবনধারণ সম্ভব নয়। ইচ্ছে থাকলেও তাই আর্ট কলেজ, ফিল্ম ইনস্টিটিউট বা ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার ধারেকাছে যাওয়া সম্ভব হয়নি। একাকিত্বের ক্ষণে তখন ওই চিঠিটাকে বারে বারে স্পর্শ করতাম। মনে হত, ওটাই আমায় শক্তি দেবে। আমার স্বপ্নকে নিয়ে বাঁচার শক্তি।

তবে অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্বপ্নেও কখনও ভাবিনি যে, একদিন বিশপ লেফ্রয় রোডের সেই বাড়িতেই গোটা প্রোডাকশন টিমের সঙ্গে বসে 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি'র চিত্রনাট্য শোনার সুযোগ হবে। বা ডকুমেন্টারি ছবি শুট করার সুবাদে প্রায় এক ঘণ্টার ইন্টারভিউ নেব সন্দীপ রায়ের। পা রাখার সুযোগ পাব সত্যজিৎ রায়ের ব্যক্তিগত স্টাডিতে। পত্রিকার ছবিতে তাঁকে যে ইজিচেয়ারে বসে কোলের খেরোর খাতায় স্কেচ করতে দেখেছি, সেই শূন্য চেয়ারটা একই জায়গায় আজও রাখা আছে। শেষ যে পোস্টারটি তিনি আঁকছিলেন, সেটাও রং-তুলি সমেত একইভাবে রাখা... থেমে যাওয়া সময়ের প্রতীক হয়ে। একদিন ফেলুদার ছবির পোস্টার ডিজাইন করার সুযোগ পাব, সেটাই বা কে জানত! একদিকে যেমন এই প্রাপ্তির তুলনা হয় না, আরেক দিকে তেমনই মনে হয়, আরেকটু যদি যোগ্য হতে পারতাম এই বিরাট কাজের জন্য!

> অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্বপ্নেও কখনও ভাবিনি যে, একদিন বিশপ লেফ্রয় রোডের সেই বাড়িতেই গোটা প্রোডাকশন টিমের সঙ্গে বসে 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি'র চিত্রনাট্য শোনার সুযোগ হবে। বা ডকুমেন্টারি ছবি শুট করার সুবাদে প্রায় এক ঘণ্টার ইন্টারভিউ নেব সন্দীপ রায়ের। পা রাখার সুযোগ পাব সত্যজিৎ রায়ের ব্যক্তিগত স্টাডিতে।

যা-ই হোক। দমদম বিমানবন্দরে ব্যাগেজ চেক সম্পূর্ণ করে এসে দাঁড়িয়েছি এয়ারলাইন্স কাউন্টারের কিউতে। আমার জন্য আজকের আসল পরীক্ষার মুহূর্ত এটাই। আমার আগে বাবুদা, শশাঙ্ক আর সাগ্নিক পটাপট ভোটার আই-ডি আর প্যান কার্ড দেখিয়ে বোর্ডিং পাস তুলে নিল। ওদেরকে ইশারায় এগতে ইঙ্গিত করলাম আমি। তারপর টিকিটের প্রিন্ট আউটটা কাউন্টারে এগিয়ে দিয়ে পকেট থেকে ধীরে ধীরে হাতের তালুতে আড়াল করে সন্তর্পণে বার করলাম আমার বিচিত্র আই-ডি।

—আই-ডি প্লিজ...

এয়ারলাইন কর্মী, সুবেশা তরুণীটি হাত বাড়াল। আর আমিও চোখ-কান বুজে এগিয়ে দিলাম যাদবপুর টু শিয়ালদা লোকাল ট্রেনের মান্থলি টিকিটের ময়লা, হলুদ এবং নেতানো ফোটো আই-ডি কার্ড। ক্যানিং, ডায়মন্ড হারবার আর লক্ষ্মীকান্তপুর লোকালের ঘেমো ভিড়ে সফর করে করে যে বস্তুটির চেহারা হয়েছে একদম মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করা প্রত্নতাত্ত্বিক স্যাম্পেলের মতো। দেখি তো, রেল কোম্পানির এই আই-ডি প্লেন কোম্পানির কাছে গ্রহণযোগ্য হয় কি না!

অভিজিৎ সরকার

(ক্রমশ)

তর্ক চলুক

সরকারি হাসপাতালে না গিয়ে ডাক্তারবাবুর প্রাইভেট চেম্বারে গেলে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা মেলে কি?

এ নিয়ে আপনার মত ১৫০ শব্দের মধ্যে লিখে পাঠান। মেইল করুন srimati.dooars@gmail.com কিংবা ইনল্যান্ড/খামে ডাকযোগে পাঠান। হাতে হাতেও জমা করতে পারেন। শেষ তারিখ ১০ জুন ২০১৭।

শ্রীমতী ডুয়ার্স
আড্ডাঘর। মুক্তাভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১

সেরা মতামতের জন্য থাকছে আকর্ষণীয় পুরস্কার

নিজস্বতা নেই বলেই নিজস্বী নিয়ে এত উন্মাদনা

গোরুমারা জঙ্গলের লাটাগুড়ির ঘটনা। সহসা জাতীয় সড়ক আগলে দাঁড়াল একটি বুনো হাতি। রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল বাস-বাইক। থমকে গেলেন পর্যটকরাও। চলল সেল্‌ফি তোলার ধুম। এক পলকের জন্য নয়। সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ একটি মাকনা হাতি মহাকালধামের কাছে জঙ্গল থেকে ৩১ নং জাতীয় সড়কের পাশে ঝোপের ধারে এসে দাঁড়ায়। এমনটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু সে দিন যেটা ঘটল তা রীতিমতো বিস্ময়কর। দীর্ঘক্ষণ ধরে পরমসহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি হয়ে দণ্ডবৎ ছিল বুনো হাতিটি। অসংখ্য সেল্‌ফি তোলা হলেও একবারের জন্যও বিরক্ত হয়নি। ভাবখানা এমন ছিল যেন ফোটোশুটের জন্য তৈরি হয়ে সেজেগুজে জঙ্গল থেকে রাস্তায় নেমে এসেছে সে। কিন্তু মানুষের এহেন সেল্‌ফি উন্মাদনায় প্রমাদ গুনছে বন দপ্তর। যে কোনও সময় একটা অঘটন ঘটে যেতে পারত সে দিন। ঘটেনি, কপাল ভাল।

অনেককাল আগে মানুষ নিজেই নিজের ছবি আঁকত, আঁকত অন্যের ছবিও। সেই ছবি দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখত। কোনও বিভোর অবসরে সেই ছবির দিকে হয়ত তাকিয়েও থাকত নিরবচ্ছিন্ন, একটানা। তারপর ক্যামেরা এল। লাঘব হল শিল্পীর পরিশ্রম। আর আমরা যন্ত্রের সঙ্গে ভোগ করে নিলাম শিল্প-যন্ত্রণা। মানবিক ত্রুটি, কল্পনার বর্ণময় বিন্যাস, শিল্পময়তা, মনের মাধুরী— এসব আর রইল না।

পুরনো আমলে ক্ষমতাবান নৃপতিরা নামী চিত্রকর ডেকে আঁকিয়ে নিতেন নিজ প্রতিকৃতি। তাঁদের শরীরের কোষে কোষে তুমুল উৎসাহ তো ছিলই, তাঁদের কোষাগারে সেই সচ্ছলতাও ছিল। রাজাধিরাজদের যা সাজে, সাধারণ মানুষের তা শোভা পায় না। তবে এখন স্মার্টফোন এসে যাওয়ার পর আমরা সবাই এক-একজন রাজা আমাদের নিজের রাজত্বে। সেল্‌ফি হল প্রযুক্তির সন্তান। এখন ছবি তুলতে আর লোক লাগে না। নিজের ছবি নিজেই তোলা যায়। স্মার্টফোনের সামনের ক্যামেরা ১২ মেগা হলে পিছনের ক্যামেরাও ৮ মেগাপিক্সেল। অত্যাধুনিক সেই যন্ত্রে আমরা নিজেদের সেল্‌ফি তুলে চলেছি নিরন্তর।

উপনিষদের ঋষি পারমার্থিক হয়ত জানতেন না 'সেল্‌ফি' বস্তুটি কী। কিন্তু জীবনদর্শনের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছিলেন, 'তৎ ত্বমসি'। অর্থাৎ তুমিই তিনি। সত্য, আত্মা ও ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত এই তত্ত্ববাক্যটিকে প্রাচীনকালে কীভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কীভাবে তা প্রতিভাত ও রূপায়িত হয়েছে, তার বিতর্কিত ইতিহাস দীর্ঘ ও দ্বন্দ্বদীর্ণ।

এই যুগে 'তৎ ত্বমসি'কে একটু ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে, 'তম ত্বমসি'। অর্থাৎ তুমিই তুমি। আমি যে আমি— এই চরম সত্যটিকে উপলব্ধি করার জন্য শুধু বার্তা বিনিময়ের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া নয়, মোবাইলের আছে নিজস্ব ক্যামেরা। আলোকচিত্রগ্রহণের নানা ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থার গর্ভে জন্ম নিয়েছে সেল্‌ফি। বাংলায় যার রূপান্তর 'নিজস্বী'। কথা বলতে বলতে, পথ চলতে চলতে, অফিসে,

আদালতে, গৃহকোণে, বিখ্যাত কোনও ব্যক্তির সান্নিধ্যলাভের সুযোগে নিজেই তুলে নাও নিজের সেল্‌ফি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, যিনি বা যাঁরা সেল্‌ফি তুলছেন, নিজস্বীতে বুঁদ হয়ে আছেন, মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছ্বাসে তাঁরাই যে সহসা ছবি হয়ে যাচ্ছেন! মুশকিল ও চিন্তার কারণ সেটাই। সেল্‌ফি তোলার জায়গা কখনও রেললাইন, কখনও ফ্লাইওভার, কখনও ওভারব্রিজ, কখনও অতিরিক্ত যানবাহনে আকীর্ণ রাস্তা তো কখনও গোরুমারা জঙ্গলের মতো হাতি চলাচলের অবাধ করিডর। সেল্‌ফি তুলতে গিয়ে বেঘোরে প্রাণ দিয়েছেন কত অসংখ্য মানুষ। তবুও 'তুমিই তুমি'র মোহ থেকে অনেকেই বেরতে পারছেন না। অনভিপ্রেত দুর্ঘটনা এড়াতে মুম্বইয়ের মতো ডুয়ার্সেও বিশেষ বিশেষ জায়গায় 'নো সেল্‌ফি জোন' করা যেতে পারে।

গ্রিক পুরাণে নার্সিসাস নামে এক শিকারি ছিলেন। অপূর্ব তাঁর চেহারা। যেমন স্বাস্থ্য, তেমন রূপ। যাঁরাই তাঁকে দেখতেন, তাঁর রূপমুগ্ধ হতেন। কিন্তু নার্সিসাস ছিলেন ভীষণ নাক-উঁচু, কারও সঙ্গে কথা বলতেন না, অবজ্ঞা করতেন সবাইকে। একদিন এক বনদেবী প্রেম নিবেদন করায় নার্সিসাস তাঁকে চূড়ান্ত অপমান করেন। সেই বনদেবীর অপমানে ব্যথিত হয়ে অদৃষ্টের দেবতা নেমেসিস অভিশাপ দিলেন যে, রূপের এই অহংকারই হবে তাঁর পতনের কারণ। এর পর একদিন একটা বনের মধ্যে ঝিলের ধারে ঘুরতে ঘুরতে নার্সিসাসের চোখ চলে গেল জলের দিকে। নিজের প্রতিবিম্ব দেখে এমনই মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে, আর জলের আয়না থেকে চোখ সরাতেই পারলেন না। পড়ে রইলেন ওই ছায়ার দিকে তাকিয়ে। কথা বলতেন নিজের ছবির সঙ্গেই। ভালবাসতেন পাগলের মতো। ওখানে দিনের পর দিন বাহ্যজ্ঞানহীন হয়ে পড়ে থেকে উপোস করে করে মৃত্যু হল তাঁর।

তা-ই থেকেই নিজের শারীরিক সৌন্দর্যে পাগল, নিজের রূপ-গুণে দিনরাত মশগুল, নিজেদের নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত ব্যস্ত থাকা মানুষদের বলা হয় 'নার্সিসিস্ট'। আজকের এই সেল্‌ফি তোলা নিয়ে হুজুগ সেই আত্মমুগ্ধতারই চূড়ান্ত প্রকাশ। সারাদিন নিজেকে নিয়েই মগ্ন থাকা আর ক্ষণে ক্ষণে নিজের ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা— এই নিয়েই ব্যস্ত সকলে। মাঝে ছবি তোলা থেকে যেটুকু সময় খালি পাচ্ছে, সেই সময়টা নিজের তোলা নিজের পুরনো ছবি স্ক্রল করে যাচ্ছে, চলছে বিচার-বিশ্লেষণ— কোন ছবিটায় কেমন লাগছে দেখতে নিজেকে, চলছে নিরন্তর পর্যালোচনা।

আগেও ফোটো তোলার দস্তুর ছিল। লোকে কোনও নতুন জায়গায় গেলে, পুরনো মানুষের সঙ্গে দেখা হলে বা বিশেষ কোনও দিন তো কাউকে বলাই হত ছবি তুলে দিতে। এমনকি স্টুডিয়োতে গিয়ে পয়সা খরচ করেও মানুষ ছবি তুলত। তারপর সেই ছবি বাঁধিয়ে রাখত দেওয়ালে। অ্যালবাম উলটে দেখত অবসর সময়ে। প্রশ্ন করা যেতেই পারে, তাহলে এখন এই কথা উঠছে কেন? তার কারণ, সুস্থতা আর অসুস্থতার মধ্যে একটা মোটা লাইন টানা আছে। লোকে দিনে দু'বার দাঁত মাজলে সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু তেরোবার মাজলে ডাক্তার দেখাতে হয়।

দাঁতের নয়, মাথার ডাক্তার। বাড়ি পরিষ্কার রাখা সুস্থতার লক্ষণ। কিন্তু অনেক শুচিবায়ুগ্রস্ত মানুষ আছে, যারা পরিচ্ছন্নতাকে এতটাই উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে যে, সারাদিন ঝাড়ু আর জলের বালতি নিয়ে ঘোরে। তেমনই এই সেল্‌ফি বাতিক। প্রাতঃপ্রণাম থেকে ঘুমাতে যাওয়া— সর্বক্ষণ একদল মানুষ নিজের ছবি তুলে যাচ্ছে। টেকনোলজির প্রশ্রয় পেয়ে এই প্রবণতা বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু মূল সূত্রটা সেই আত্মকাম— 'নার্সিসিজম'।

আত্মপ্রতিকৃতিও কি আত্মকেন্দ্রিকতার পরম পরাকাষ্ঠা নয়? নিজেকে চরম ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ নয়? সম্ভবত তা-ই। তবে মুশকিল হল, সকলেই ছবি আঁকলেও কেউ কেউ হয় আঁকিয়ে। পাবলো পিকাসো কিংবা ভ্যান গঘ তো আর ঘরে ঘরে জন্মান না। সেল্‌ফির সেসব পিছুটান নেই। ছবি আঁকতে না জানলেও কোনও অসুবিধে নেই। যন্ত্রই তুলে দেবে নিখুঁত প্রতিকৃতি। আগেও মানুষ নিজেকে আয়নায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখত, নিজেকে স্থাপন করত বহুকৌণিকতায়। কিন্তু সেল্‌ফি-বিপ্লবের সঙ্গে তার ফারাক হল নিলাজপনায়। এখন 'আত্ম' আছে, 'কেন্দ্রিকতা' আছে, কিন্তু কোনও জড়তা নেই। এই যে দৃপ্ত অহংকারী ভঙ্গিমা, এই যে বেপরোয়া চাল, বেতোয়াক্কা চলন— শুধু সেল্‌ফিই পারে এর কপিরাইট দাবি করতে! সত্যি বলতে কী, এসবই হল অসুস্থতা। সেল্‌ফি তোলার এই হিড়িক আসলে নিদারুণ একাকিত্বের লক্ষ্মণ। এ হল নিজেকে ভালবাসার নামে ভালবাসাহীনতা, ভাঁড়ামো ও ভণিতা।

এই সর্বনাশটা যে একদিন ঘটবে, ক্রিস্তভ কিয়েসলস্কি সাহেব অনেক আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। ছবির নাম 'ক্যামেরা বাফ'। এক ভদ্রলোকের ক্যামেরা নিয়ে উন্মাদনা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, ক্যামেরার বাইরে আর কিছু ভাবতে ভুলে যান তিনি। এমনকি তাঁর স্ত্রীর চলে যাওয়াও যেন তাঁর কাছে একটা 'ফ্রেম' ছাড়া আর কিছু নয়। এভাবে ক্রমশ একলা হয়ে যাওয়া মানুষটাও যখন নিজের পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে বা সেসবের 'ছবি' হয়ে ওঠার যোগ্যতা সম্বন্ধে উৎসাহ হারান, তিনি ক্যামেরা ঘুরিয়ে দেন নিজের দিকে। ছবি শেষ হয় ওই 'ক্যামেরা বাফ'-এর সেল্‌ফি দিয়ে। যাকে বলা যায়, হি শুটস হিমসেল্‌ফ!

> সেল্‌ফি আসলে নিজেকে খোঁজার নেশা। সেল্‌ফি তুলছে মানুষ। নিজেকে খুঁটিয়ে দেখছে গোয়েন্দার মতো। ছবির মধ্যে খুঁজে পাচ্ছে না নিজেকে। আগের ছবিটাকে ডিলিট করে আবার সেল্‌ফি তুলছে। নিজস্বীর স্তূপে হারিয়ে ফেলা 'আমি'কে খুঁজে যাওয়ার ঘোরে উন্মাদের মতো হয়ে উঠেছে সবাই।

সেল্‌ফি আসলে নিজেকে খোঁজার নেশা। সেল্‌ফি তুলছে মানুষ। নিজেকে খুঁটিয়ে দেখছে গোয়েন্দার মতো। ছবির মধ্যে খুঁজে পাচ্ছে না নিজেকে। আগের ছবিটাকে ডিলিট করে আবার সেল্‌ফি তুলছে। নিজস্বীর স্তূপে হারিয়ে ফেলা 'আমি'কে খুঁজে যাওয়ার ঘোরে উন্মাদের মতো হয়ে উঠেছে সবাই। আমাদের ক্রমবর্ধমান সেল্‌ফি-প্রবণতা বুঝিয়ে দেয়, আমরা ক্রমশ একলা, আরও একলা হয়ে যাচ্ছি। একসঙ্গে থাকার ভান করছি মাত্র। সেই ভান, সেই অভিনয় আমাদের এমন মজ্জাগত হয়ে যাচ্ছে যে, আমরা সেই অভিনয়টা চিনতেও পর্যন্ত পারছি না। আশপাশ তো বটেই, নিজেকে নিজে ঠকানোটাও আমাদের জীবনযাত্রারই একটা অঙ্গ, অপরিহার্য একটা অংশ হয়ে উঠেছে যেন।

ডুয়ার্সের অনাদৃত রতন

মুকুল রক্ষিত

জয়ন্তি নদী টপকে হাতিপোতা। কিলোমিটারের হিসেব জানা নেই। একদা আলিপুরদুয়ার থেকে যাত্রীবাহী বাস রাজাভাতখাওয়া, জয়ন্তি, হাতিপোতা, শামুকতলা হয়ে আসা-যাওয়া করত। '৯৩-এর বন্যায় সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেল। কীভাবে মুকুলদার সঙ্গে সখ্য গড়ে ওঠে, সে-ও এক ইতিহাস। ডুয়ার্সের রোজনামচায় বহুবার উল্লেখ করেছি। মনে পড়ে, বছর তিরিশ আগে দোলপূর্ণিমায় কার্তিকার জঙ্গল ছুঁয়ে ময়নাবাড়ি, তুরতুরি হয়ে হাতিপোতা হাটতলা। সে সময় লম্বা বাসই ছিল একমাত্র বাহন। গোনাগুনতি বাস আলিপুরদুয়ার থেকে সলসলাবাড়ি, শামুকতলা, রায়ডাক, ধওলা, কোহিনুর চা-বাগান হয়ে তুরতুরিতে ঘুরপাক খেয়ে হাতিপোতায় যাত্রা শেষ করত। আমার ভ্রমণসাথি রাজেন পান্ডে। গন্তব্য ভুটানঘাট। অবশ্যই পায়ে পায়ে।

হাতিপোতা থেকে ভোরবেলায় রওনা হতে হবে। পকেটে জগন্নাথদা, তিনুদার চিরকুট— 'মুকুল, দুই ভ্রমণ-পাগল যাচ্ছে, রাতে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ো।' ভরদুপুরে হাতিপোতা হাটতলা নেমে দেখি 'হোলি হ্যায়', আবির-রঙের গন্ধ বাতাসে। নিঝুম হাটতলা। রং মেখে ভূত সেজে অনেকে ছোটাছুটি করছে। বাস থেকে দু'জনে নেমে সামনে যাকে পাই, জিজ্ঞেস করি, 'হ্যাঁ রে, মুকুলবাবুকে চিনিস?' 'ওই যে জংবাহাদুরের দোকানে জেঠু বসে আছে।' জংবাহাদুরকে দেখতে কেমন কিছুই জানি না। মাথায় চাপা টেনশন, সন্ধ্যা হয়ে গেলে থাকব কোথায়? জংবাহাদুরের দোকানে ঢুকে দেখি মুকুলদা বেঞ্চিতে বসে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন।

—নমস্কার। পরিচয় দেওয়ামাত্র তড়াক করে লাফিয়ে ওঠেন।

—আসেন আসেন। আপনার নাম আমি শুনেছি। আর জগন্নাথদা। ওঁর মতন মানুষ হয় না।

—আগামীকাল সকাল সকাল ভুটানঘাট বেড়াতে যাব। এ যাত্রায় শুধু দেখে-শুনে ফিরে আসা। পরে অন্য সময় বনবাংলোতে থাকব।

—সব ব্যবস্থা হইয়া যাইব। কোনও চিন্তা কইরেন না।

ঘর ভরতি লোকজন। হাতিপোতা ডাকঘরের পোস্টমাস্টার, হোমিয়োপ্যাথ

আমাকে ভালবাসে। বিপদে-আপদে ওরাই আমার পাশে থাকে। আমিও ওদের সুখ-দুঃখের অংশীদার, ভাগীদার।' যা-ই হোক, হাতিপোতা হাটতলার উপরে জরাজীর্ণ, লজ্ঝড়ে ডাক্তারবাবু, স্থানীয় চা-শ্রমিক, হোলি নিয়ে হল্লা, গেঁজু গল্পের আসর। জংবাহাদুর গজা, খুরসা, নিমকি, জিলিপি, শিঙাড়ার মাঝখানে স্ট্যাচুর মতো বসে আছে। লকড়ির চুলা। দাউদাউ করে জ্বলছে। এ এক আজব দোকান।

মুকুলদা বললেন, 'আগামীকাল রং খেলা। বুঝতেই পারছেন, মোদোমাতালের সংখ্যা বাড়বে। মারপিট তো আছেই। আমাকে সব সামলাইতে হয়, না হইলে আমিও আপনাদের সঙ্গে যাইতাম।'

যা-ই হোক, অনেক গল্প-আড্ডা হল। দেশের বাড়ি ময়মনসিং-এর টাঙাইলে। আমার জন্ম মুক্তগাছায় শুনে মুকুলদা বেজায় খুশি। 'তাহলে তো আপনি আমার দ্যাশের লোক।' কিছুতেই জংবাহাদুরকে পয়সা দিতে দিলেন না। 'রাইতে জংবাহাদুরের দোকানে খাইবেন যা রান্না হয়।' পান্ডেজি বলল, 'ঠিক আছে। চলেন, আস্তানাটা দেখে আসি।' মুকুলদা বললেন, 'আগে চলেন আমার ঘরে।' বাজারের উপরে, তাউজির দোকানের পিছনে। অতীব জরাজীর্ণ ছাপরাঘর। টালির ছাউনি। মাথায় প্লাস্টিক জড়ানো। কাঠ, টিনের বেড়া। হেলে পড়া ঘর। গেটের কাছে গলঘণ্টা। গোরুর গলায় থাকে। এটাই কলিং বেল। ভিতরে ঢুকে সত্যি অবাক হচ্ছি। 'গৌরীবাবু, একটু দাঁড়ান। কুপিটা ধরাই।' ছোট্ট তক্তপোশ। ভাঙাচোরা কাঠের মেঝে। বিছানার একপাশে মশারির অর্ধেক টাঙানো। দড়িতে জামাকাপড় ঝোলানো। স্টোভ, থালা, ঘটি, বাটি। 'এই হইতেছে আমার বাইদ্যার সংসার। আর কী! খাই না খাই, দেখার কেউ নাই। ইচ্ছা হইলে রান্না করি, না হলে জংবাহাদুরের দোকানে, কোনও দিন যতন, বাদলের দোকানে যা পাই খাইয়া নিই।' বড় নির্মোহ, নির্বিকার, নিরাসক্ত জীবন। রাজনীতির ছত্রছায়ায় ছিলেন বহুকাল। 'দেখে-শুনে ঘেন্না ধরে গিয়েছে। তাই নামের আগে কমরেড মুছে দিয়েছি। আশপাশের চা-বাগানের বাবু, শ্রমিকরা

তালি-তাপ্পি মারা কাঠের দোতলায় রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করে দিলেন সদাশয় মুকুলদা। জংবাহাদুরের দোকানে রাতের আহার সেরে বিছানায়। খোলা জানালা দিয়ে ফিনকি দিয়ে জ্যোৎস্না লুটিয়ে পড়েছে কাঠের মেঝে, মশারিতে। ক্ষণে ক্ষণে ডেকে চলেছে— চোখ গেল চোখ গেল। সেই সঙ্গে ঢোল বাজনা, ঝুমুর ঝুমুর শব্দের সঙ্গে হোলির গান। শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি। প্রত্যুষে পান্ডেজি স্নান, পূজাপাঠ সেরে ফিটফাট। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে হবে। মুকুলদা যথাসময়ে হাজির। মুজিবর রহমান নামে একটি ছেলে আমাদের পথপ্রদর্শক। নাস্তা সেরে চায়ে চুমুক দিয়ে বেরিয়ে পড়া। মুকুলদা কিছুটা পথ এগিয়ে দিয়ে ফিরে গেলেন। ভুটানঘাট, পিপিং, ঝোলেনা সাঁকো, পাঁচরঙা পাহাড় দর্শন। অরণ্য ভ্রমণ সেরে সন্ধ্যায় হাতিপোতায় ফেরা। তারপর যথারীতি আড্ডা। অতঃপর ভুটানঘাট, হাতিপোতা লাগাতার পরিক্রমা। লক্ষবার আসা-যাওয়া। 'ভ্রামণিকের পাঁচালি'তে সেসব নিয়ে বিস্তর লিখেছি।

পরবর্তীকালে স্রেফ মুকুলদার টানে হাতিপোতায় চলে আসতাম। কত মানুষজনের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রহিমাবাদের মিজানুর, হাতিপোতার রণজিৎ, সঞ্জীব, নারায়ণ, নন্দনপ্রসাদ, তাউজি, বাদল, ডাকঘরের পোস্টমাস্টার তাপস, জয়ন্তি চা-বাগানের ছবি, উত্তম, পুলিশ আউটপোস্টের লোকজন, ফাসখাওয়া, চুনিয়াঝোরা, জয়ন্তি দক্ষিণবাদ, ১২ নং অ্যাপার্টমেন্ট (এখন যেখানে বনবাংলো), জংবাহাদুর— কত নাম বলব। আনন্দে-উল্লাসে মজা করে কাটিয়ে দিতাম।

রাতে মুকুলদার ডেরাতে থাকা এক প্রকার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। চারদিক উদোম। চা-বাগান, উঠোনে শুকনো কাঁঠাল, সেগুনপাতা জমে থাকত। নানারকম ফলফলারি গাছ। একটু নিঝুম হলেই তক্ষকের ডাকাডাকি। রাতে টিমটিমে হ্যারিকেন। ভামেরা চলাফেরা করত নিঃশব্দে, মাঝে মাঝে মারপিট। তক্ষকের শব্দে ঘুম ভাঙত, ভয় করত। মুকুলদা নিজের বিছানাটা আমাকে ছেড়ে অন্যত্র থাকতেন। একবার দেখি, লেপার্ড ছানাপোনা নিয়ে মুকুলদার ঘরের দরজার কাছে বস্তার উপর শুয়ে। দরজা খামচে যাচ্ছে। সহস্র কীটপতঙ্গের বসবাস। সাপেরা নির্ভয়ে চলাফেরা করত। মুকুলদা বলতেন, 'আমি ময়মনসিং-এর পুলা। ভয়ডর নাই।'

হাতিপোতা গেলেই এদিক-ওদিক বেড়ানো হত। বিশেষ করে চুনিয়া, ফাসখাওয়া, কার্তিকা, রায়ডাক, ভুটানঘাট কতবার যে গিয়েছি, হিসেব নেই। একবার মুকুলদার ঘরে পিকনিক হয়। স্রেফ মাংস-ভাত। মুকলদাই রাঁধেন। নারকেলের নাড়ু, তক্তি তৈরি করে খাওয়াতেন। প্যাকেটে বা কৌটোয় ভরে ব্যাগে ঢুকিয়ে বলতেন, 'বউদিরে দিয়েন।' একবার হাতিপোতা ডাকঘরের পোস্টমাস্টার তাপসের বাড়ি মহাকালগুড়ি টিপ থেকে হেঁটে নারান থলি নজরমিনার, জলাশয়ে বেড়াতে যাই। কত স্মৃতি মনে পড়ে। হাতিপোতাকে ভালবেসে কোথাও গেলেন না। হঠাৎ একদিন রণজিৎ, নারায়ণ খবর পাঠায়, 'কাকু, মুকুলজেঠুকে কোচবিহার হাসপাতালে ভরতি করানো হয়েছে। অবস্থা ভাল নয়।' সব কাজ ফেলে ছুটে যাই কোচবিহার হাসপাতালে। নারকীয় পরিবেশ। পূতিগন্ধময়। এদিক-ওদিক তাকাই। নার্সকে জিজ্ঞেস করি। 'ওই যে। দরজার কাছে বেডে ঘুমুচ্ছে।' কাছে যাই। মাথায় হাত রাখি। চোখ মেলে যেই আমাকে দেখেন, অমনি শিশুর মতন হাউহাউ করে বলেন, 'গৌরীবাবু, আমারে লইয়া যান। মরতে হয় হাতিপোতায় মরুম।' কিছুতেই কবজি ছাড়েন না। নার্সরা বুঝিয়েসুঝিয়ে হাত ছাড়ান। শিলিগুড়ি ফিরে আসি। ক'দিন বাদে নারায়ণ, রণজিৎ, উত্তম হাতিপোতা থেকে জানায়, 'মুকুলজেঠু চলে গিয়েছে। গতকাল হাতিপোতায় দাহ করা হয়েছে।' মনটা সত্যি ভীষণ আপসেট হয়ে পড়ে। কী করব ভেবে পাই না। সূর্য ওঠার আগে রওনা হই হাতিপোতার উদ্দেশে। দুপুর নাগাদ পৌঁছে যাই। শূন্য বাইদ্যার ঘর। জামাকাপড় গামছা বিছানা মশারি খইনির ডিব্বা— সব পড়ে আছে। মানুষটা নেই। রণজিৎ, সঞ্জীবরা বলে, 'কাকু, কেন মন খারাপ করেন। আমরা তো আছি।' উত্তমের স্কুটারে চড়ে জয়ন্তি চা-বাগানের কোয়ার্টারে। মনে পড়ে, নিশুতি রাতে আমি আর মুকুলদা ফিরে আসছি হাতিপোতা। ভরা থাক স্মৃতিসুধায়। মুকুলদা চলে যাবার পর জংবাহাদুরও মারা যায়। হাতিপোতা, ভুটানঘাট যাওয়া হয় না অনেকদিন।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস

চিত্রকথা 'ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস'। পর্ব-১১। এই চিত্রকথা কোনওভাবেই ছোটদের জন্য নয়। আর কাহিনির সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজতে যাওয়া অনভিপ্রেত।

EKHON DUARS, Vol-4, Issue-5 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস

কাহিনি : বৈকুণ্ঠ মল্লিক, ছবি : দেবরাজ কর

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.